দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৭ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ২ ডিসেম্বর, ২০২৪।। ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

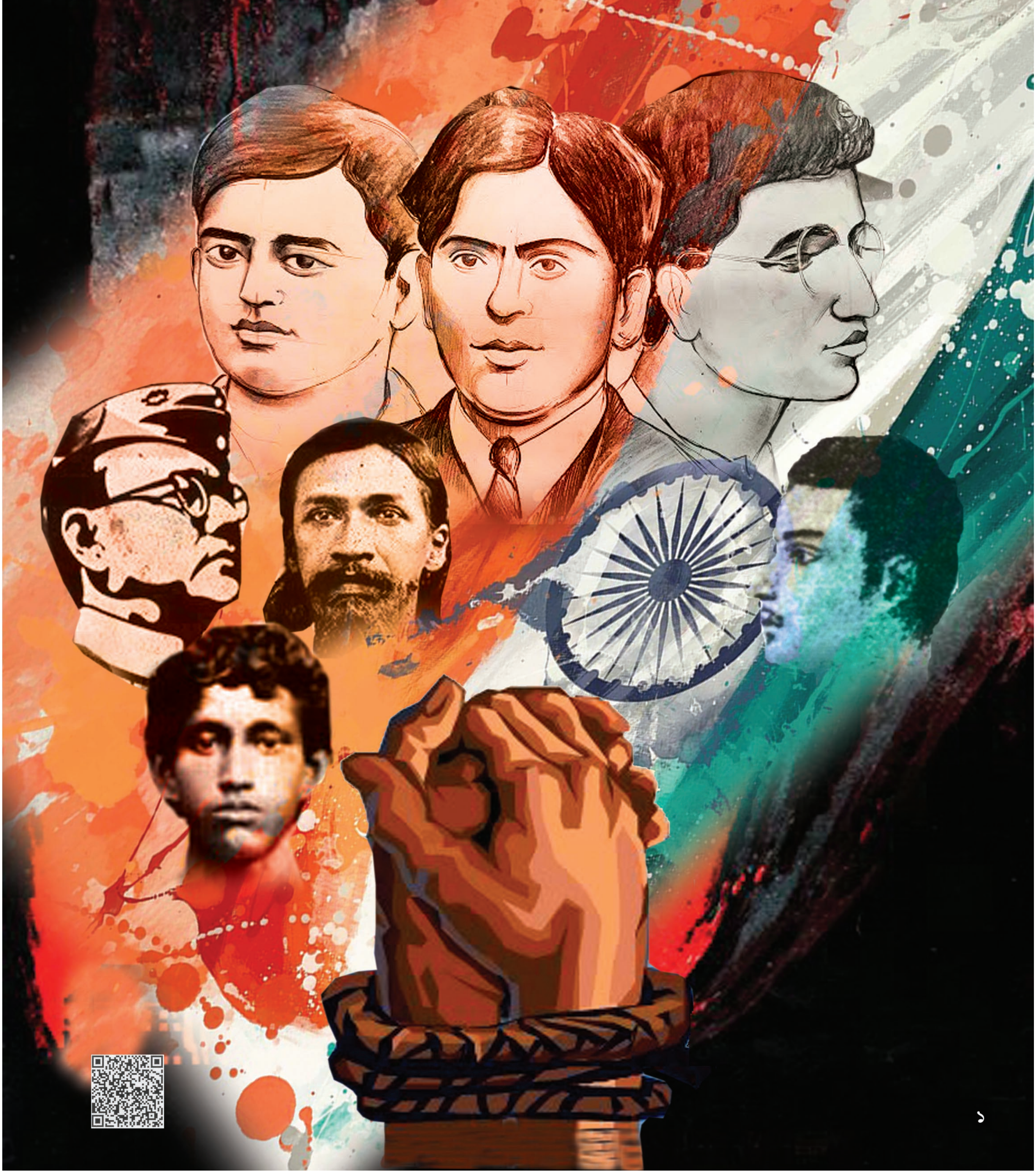

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২ ডিসেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

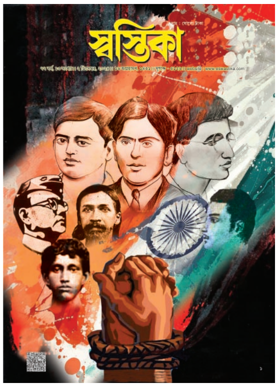

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

পশ্চিমবঙ্গে আদৌ কি মিটবে প্রকৃত বিরোধী মুখের অভাব? ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ভাইপো হটাও, পিসির গদি বাঁচাও ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতি ◻ অশ্বিনী বৈষ্ণব ◻ ৮

বাংলাদেশে আক্রান্ত গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

বেলডাঙার ঘটনা : পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের একটি গুরুতর সতর্কবার্তা ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ১১

স্বাধীনতাযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ : ক্ষুদিরাম বসু ◻ রাজদীপ মিশ্র ◻ ১৩

শ্রীঅরবিন্দ : বিপ্লব থেকে বিধাতার সন্ধানে ◻ সুজিত রায় ◻ ১৬

বিপ্লবীদের বলিদান ভুলে যাওয়া জাতির পক্ষে একটি অপরাধ ◻ অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ১৯

ডিসেম্বরে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ডাকটিকিট ◻ সৈকত চট্টোপাধ্যায় ◻ ২০

ওরা মৃত্যুমঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছে জয় মা ভারতজননী ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ২৩

কাশীর অনন্যতার এক নাম মহামহোপাধ্যায় ড. গোপীনাথ কবিরাজ ◻ হীরক কর ◻ ৩১

উপাসনা ইষ্টের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটায় ◻ আর্য সারথী ◻ ৩৪

বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী এবং ধুনি সাহেব মঠ ◻ সুব্রত চাকী ◻ ৩৫

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) : অতীত, বর্তমান এবং প্রাচীন জ্ঞান ◻ শর্মিষ্ঠা শী কানরার ◻ ৩৬

ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের রাষ্ট্রভাবনা ◻ শ্রীকুমার চন্দ্র পর্বত ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৬-৩০ ◻ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮ ◻ রঙ্গম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৫০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৯ ডিসেম্বর, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ওয়াকফ সংশোধনী বিল : কী ও কেন?

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে ওয়াকফ বোর্ড এবং ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে চলছে বিতর্ক। দাবি উঠেছে ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা ও কাঠামোগত পরিবর্তনের। শোনা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই বিতর্কের সমাধানের প্রচেষ্টায় বিজেপি সরকার ওয়াকফ সংশোধনী বিল আনতে চলেছে সংসদে। এই নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে গড়ে উঠছে জনমত।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ওয়াকফ বোর্ডের কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়েই আলোচনা করবেন বিশিষ্ট আইনজীবী ধর্মানন্দ দেব, দেবজিৎ সরকার, ভাস্কর চ্যাটার্জি, অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী প্রমুখ।

প্রকাশিত হবে ৯ ডিসেম্বর, ২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০৲ + ৩৬০৲ রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০৲ + ৮৫০৲ রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চাই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন

ভারতবর্ষ বৈদেশিক শাসন হইতে শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছে। ভারতবাসী স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়াছে, তাহা শুধুমাত্র তাঁহাদের জন্যই। তাঁহারা জীবন ও মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করিয়া জীবন বলিদান করিয়াছেন বলিয়াই ভারতবাসী স্বাধীন জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে পারিয়াছে। তাঁহারা ভারতমায়ের দামাল সন্তান। চিরকালই তাঁহারা বিপ্লবী। শুধু অগ্নিযুগেই নহে, যুগে যুগেই তাঁহারা দামাল। তাঁহাদের রক্তেই লড়াই রহিয়াছে। দেশমাতৃকার অপমানের বিরুদ্ধে লড়াই। স্বাভিমান রক্ষার লড়াই। ঘোর মধ্যযুগে তাঁহারাই প্রবল শক্তিশালী বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। সেই ললিতাদিত্য মুক্তপীড় হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথ্বীরাজ চৌহান, হরিহর ও বুক্ক, রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, রানি দুর্গাবতী, গুরু গোবিন্দ সিংহ, বীর বাজীরাও পেশোয়া—সকলেই স্বাধীনতাসূর্যকে অম্লান রাখিবার জন্য মরণপণ লড়াই করিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভেই ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের শৌর্যগাথা ভারতবাসীর অন্তরে অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অগ্নিযুগে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্র-যুবার লড়াই বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য। সহায় সম্বলহীন, কিন্তু হিমালয়সম মনোবলে তাহারা ব্রিটিশ রাজশক্তির ভিত কাঁপাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিপ্লব প্রচেষ্টা বঙ্গভূমি ছাড়াইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই লড়াইকে ইতিহাসকারগণ সশস্ত্র সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সংগ্রামে ইংরাজি ডিসেম্বর মাসটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসেই বহু বিপ্লবীর আবির্ভাব ও তিরোধান দিবস এবং একাধিক বিপ্লবী কার্যকলাপ সংঘটিত হইয়াছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিক ঋষি অরবিন্দের প্রয়াণ দিবস ডিসেম্বর মাসেই। তেমনই অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর আবির্ভাব দিবস। রাইটার্স অলিন্দযুদ্ধের তিন মহানায়কের মধ্যে দীনেশ গুপ্তের জন্মদিন এই মাসেই। তেমনই বাদল গুপ্ত ও বিনয় বসুর আত্মবলিদান দিবস এই মাসেই। অলিন্দযুদ্ধের রোমহর্ষক ঘটনাও এই মাসেই সংঘটিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের সহকর্মী অনন্ত সিংহের আবির্ভাব এই মাসেই। বুড়িবালামের যুদ্ধের নায়ক বাঘাযতীনের আবির্ভাবও এই মাসেই। আরও কত যে বিপ্লবীর আবির্ভাব ও তিরোধান এই মাসে তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সন্ধান করিলেই মিলিবে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল, যাহাদের জন্য দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে, তাঁহাদের দেশবাসী বিশেষ করিয়া বর্তমান প্রজন্ম কতটা মনে রাখিয়াছে? সত্যিকথা হইল, মনে রাখিবার ব্যবস্থাও করা হয় নাই, উপরন্তু ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিদ্যালয় পাঠ্যে শেখানো হইয়াছে দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে গান্ধী-নেহরুর হাত ধরিয়া সম্পূর্ণ অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে। ইহা যে মিথ্যা তাহা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি। তিনি স্বীকার করিয়াছেন তাহারা ভারত ত্যাগ করিয়াছেন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভয়ে ভীত হইয়া। তাহা সত্ত্বেও দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদনকারী এবং তাহাদের সহযোগীরা বৎসরের পর বৎসর মিথ্যা প্রচার করিয়া বিপ্লবীদের অশ্রদ্ধা করিয়াছে শুধু নহে, তাহাদিগকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যাও প্রদান করিয়াছে। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনকারী স্বাধীনতাযুদ্ধের বিপ্লবী সৈনিকরা ছিলেন অখণ্ড ভারতের পূজারি। তাঁহাদিগের আত্মা সেই দিনই শান্তি পাইবে যেইদিন ভারত পুনরায় অখণ্ড হইবে। অখণ্ড ভারতের পুনঃস্থাপনই হইবে তাহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন।

সুভাষিতম্

ঈর্ষ্যী ঘৃণী ন সন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ যড়েতে নিত্যদুঃখিতঃ।। (বিদুরনীতি)

ঈর্ষাকারী, ঘৃণাকারী, অসন্তুষ্ট, ক্রোধী, সদা সন্দেহকারী এবং অন্যের ওপর নির্ভর করে জীবনধারণকারী— এই ছয় প্রকার মানুষ সবসময় দুঃখী থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে আদৌ কি মিটবে প্রকৃত বিরোধী মুখের অভাব?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সারা দেশেই মুখের রাজনীতি চলছে। পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। তাও হচ্ছে। কেন? মহারাষ্ট্রে আর হরিয়ানাতে বিজেপির বিপুল জয় যেমন মুখ ধরা আর পালটানোর রাজনীতির স্বাক্ষর রেখেছে পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডে এই মুখ রাজনীতি ছেড়ে স্লোগানধর্মী হওয়ায় বিজেপি ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। বিজেপির জয়ের অনেকটা জুড়েই রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখ। এই রাজ্যের শাসক দলের মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাটে বহুবার লেখা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত বিরোধী মুখের অভাবের সুবিধা পাচ্ছেন মমতা। তা নাহলে তৃণমূলের ঘটি উলটে যেত। এখন পর্যন্ত সে অভাব যেমন পূরণ করতে পারেনি বিজেপি, তেমনই নক্ষত্র সমান দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপ্রাসঙ্গিক ও অস্তিত্বহীন বিদেশি বাম দল এবং কংগ্রেস।

প্রকৃত বিরোধী মুখের অভাবেই তেরো বছর ধরে একটি সমানুপাতিক বিরোধীহীন রাজ্য শাসন করে চলেছেন মমতা। যার ফলে এই সময়ের মধ্যে কোনো প্রকৃত রাজনৈতিক লড়াইয়ের সম্মুখীন তিনি হননি। তাই আমার কাছে তিনি 'ডিফল্ট মুখ্যমন্ত্রী' বা 'অ্যাপোলোজেটিক চিফ মিনিস্টার' যাকে অনেকটা বাধ্য হয়েই রাজ্যের মানুষ মেনে নিচ্ছেন। 'নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে'। দুর্নীতি ও অন্যায়ের পাহাড় মাথায় নিয়েও জিতছেন মমতা। যার অপব্যাখ্যা হলো মানুষের আশীর্বাদ। অনেকে বলতেই পারেন প্রকৃত বিরোধী মুখের উত্থান ঘটছে না কেন প্রধান বিরোধী দলের মধ্য থেকে? উত্তরটা সোজা। প্রকৃত সিপিএম-বিরোধী মুখ হয়ে উঠতে মমতার সময় লেগেছিল আনুমানিক বিশ বছর। কংগ্রেস দলের ভিতরে-বাইরে লড়েছিলেন মমতা। আর বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বিরোধী রাজনৈতিক মুখ হওয়ার বয়স কেবল চার। সময়কে আগু পিছু করা যায় না। তাই হতাশ না হয়ে মমতা-বিরোধিতার মুখ বিজেপিকে বের করতেই হবে। রাজনীতি লম্বা দড়ির খেলা।

সম্প্রতি রাজ্যে ছ'টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে মাদারিহাটে বিজেপির অপ্রত্যাশিত পরাজয় নিয়ে চর্চার যেমন প্রয়োজন, তেমনই দরকার এটা জানার যে কেন দু'টি নির্বাচন কেন্দ্র— হাড়োয়া আর সিতাইয়ে প্রধান বিরোধী দল বিজেপির জমানাত জব্দ হলো। বিজেপিকে নিয়ে এ রাজ্যের মুসলমানদের সাফল্যের সঙ্গে ভুল বুঝিয়েছেন মমতা। হাড়োয়া মুসলমান অধ্যুষিত আসন। বিজেপির জেতার কথা নয়। কিন্তু সিতাই? বিজেপির দুর্গ উত্তরবঙ্গে এই দুর্দশা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। তা যত না হয় বিজেপির পক্ষে তা মঙ্গল। তাতে আত্মানুসন্ধান আর ভুল শোধরানোর কাজ এগোবে। বিজেপি মুসলমান বিরোধী এই মিথ্যা আওয়াজ তোলার ফলে ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত মুসলমান ও জনজাতি অধ্যুষিত ১৮ আসনের মাত্র একটি পেয়েছে বিজেপি। উত্তর ও দক্ষিণ ছোটোনাগপুর থেকে কিছু আসন পেলেও কোলহান এলাকায় ভরাডুবি হয় বিজেপির। মহারাষ্ট্র কিন্তু বিজেপিকে ফল দিয়েছে একেবারে উলটো। শুভেন্দুবাবু বা সুকান্তবাবুরা মমতার এই মিথ্যার মোকাবিলা এখনও করতে পারেননি।

> **বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বিরোধী রাজনৈতিক মুখ হওয়ার বয়স কেবল চার। সময়কে আগু পিছু করা যায় না। তাই হতাশ না হয়ে মমতা-বিরোধিতার মুখ বিজেপিকে বের করতেই হবে।**

বিজেপির রাজনৈতিক দর্শনের প্রাণপুরুষ চিন্তাবিদ দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর একাত্ম মানবদর্শনে যে দেশ বা ভারতের উত্থানের কথা বলেছেন, তা মমতার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। শুভেন্দুবাবু বা সুকান্তবাবুদের তা মানুষকে বোঝানোর অনেক সুযোগ রয়েছে। আমি বহুবার লিখেছি, তৃণমূল বা কংগ্রেসের মতো বিজেপি কোনো সাধারণ দল নয় যারা কেবল ভোটে জেতার জন্য লড়ে। বিজেপির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলাদা। সারা দেশে একটি জাতীয়বাদী সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো তাদের লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য ধরে বিজেপি সারা দেশে এককভাবে ১৫টি এবং জোট করে ২০টি রাজ্য শাসন করছে। মমতা ব্যানার্জি দেশের আর পাঁচজন রাজনীতিকের মতো দানখয়রাতি দিয়ে রাজ্যের মানুষকে বুঝিয়েছেন তিনি কেবল এই কাজই করতে পারেন। পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে মমতা তা করছেন। মুখ বদলের রাজনীতি করে ক্ষমতায় এসেছিলেন মমতা। আর তাঁকে সরাতে মুখের রাজনীতিই লাগবে। সংগঠনে মমতার বদল আসন্ন। কিন্তু তার বদলি নতুন মুখের উত্থান প্রয়োজন মানুষের সামনে। ১৫ মাস বাদেই সে পরীক্ষা। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। বিজেপির অগ্নিপরীক্ষা। বিজেপিকে এই রাজ্যে মুখের রাজনীতি করতে হবে। মানুষ তাই চান। মমতার বদলি মুখ।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ভাইপো হটাও, পিসির গদি বাঁচাও

ক্ষমতাপ্রিয়াষু দিদি,

আপনি নেত্রী। আপনিই দলের মুখ। আপনিই মুখ্যমন্ত্রী। একমেবাদ্বিতীয়ম্! ২০২৬ সালের ভোট পর্যন্ত এর বাইরে যে কিছু হবে না, দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের একগুচ্ছ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেই বার্তাই আপনি দিয়েছেন। তৃণমূলের মধ্যে থেকে যে ভাবে ভিন্ন স্বর উঠছিল, তা থামিয়ে দিলেন। বৈঠকের শেষে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে দিয়ে যে যে ঘোষণা আপনি করিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, তৃণমূলের সংগঠনে আপনিই নিরঙ্কুশ। একমেবাদ্বিতীয়ম্! ভাইপোশ্রী ধারে-কাছেও নেই।

মূলত তিনটি বার্তায় দলের উপর আপনার 'নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ' স্পষ্ট করেছেন। এক, জাতীয় কর্মসমিতিতে সংযোজনের তালিকা। দুই, বিভিন্ন জনের কথা বলায় গণ্ডি টেনে দেওয়া। তিন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাকে 'গৌণ' করে দেওয়া।

অভিষেক অনেক দিন থেকেই 'নবীন নবীন' করে চিৎকার করে আসছেন। কিন্তু আপনি বুঝিয়ে দিলেন ওসব হবে না। জাতীয় কমিটিতে প্রবীণদেরই 'গরিষ্ঠতা' রইল। উলটে বেড়ে গেল। পুনর্গঠিত কমিটিতে জায়গা পেলেন দলের পাঁচ প্রবীণ নেতা— বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই সাংসদ মালা রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের দুই মন্ত্রী জাভেদ খান এবং মানস ভুঁইয়া। এঁরা সকলেই আপনার 'ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন'। মানে আপনার দাসানুদাস। ভাইপোর হুমকিতে মজবেন না। প্রত্যেকেই প্রবীণ। যাঁরা অভিষেক বর্ণিত বয়ঃসীমা পেরিয়ে গিয়েছেন। সম্প্রতি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যখন তৃণমূলের নেতারা প্রশ্ন তুলছিলেন, হুমায়ুন কবীরের মতো কেউ কেউ যখন অভিষেককে উপমুখ্যমন্ত্রী করে তাঁর হাতে পুলিশ দপ্তর দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করছিলেন, তখন ময়দানে নেমেছিলেন কল্যাণ। শ্রীরামপুরের এই তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য ছিল, পুলিশ নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রকারান্তরে মমতারই সমালোচনা করা হচ্ছে। কল্যাণ স্পষ্ট বলেছিলেন, 'যাঁরা মনে করছেন মমতাকে বাদ দিয়ে তৃণমূল, তাঁরা একটু সামনে এসে বলুন না!' সেই কল্যাণকে কাছে টেনে আপনি তো ভাইপোকেই দূরে পাঠালেন।

অভিষেক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু সোমবারের বৈঠক শেষে চন্দ্রিমা যে তালিকা পড়েছেন, তাতে অভিষেকের নাম রয়েছে দিল্লির মুখপাত্রদের তালিকার এক নম্বরে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, অভিষেককে কি রাজ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো? যদিও চন্দ্রিমা বলেছেন, 'উনি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি সব বিষয় নিয়েই বলবেন।'

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নাম কেন মুখপাত্রদের তালিকায় থাকবে?' তবে কি দিদি অভিষেকের 'সীমা' বেঁধে দেওয়া হলো? তিনি কি দিল্লি ছাড়া কোনও বিষয়ে কথা বলতে পারবেন না? রাজ্যের কোনো বিষয়ে তাঁর মতপ্রকাশে কি দাঁড়ি টানা হলো?

চন্দ্রিমার জবাব দিদি আমার কিন্তু হজম হয়নি। তাই যদি হবে, তা হলে দিল্লির মুখপাত্রদের তালিকায় অভিষেকের নাম বলার কারণ কী? দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নাম কেন মুখপাত্রদের তালিকায় থাকবে?' তবে কি দিদি অভিষেকের 'সীমা' বেঁধে দেওয়া হলো? তিনি কি দিল্লি ছাড়া কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারবেন না? রাজ্যের কোনো বিষয়ে তাঁর মতপ্রকাশে কি দাঁড়ি টানা হলো?

তৃণমূলে 'নবীন বনাম প্রবীণ' লড়াই শুরু হয় ২০২১ সালে দল তৃতীয়বার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে পরেই। তা বড়ো আকার নেয় গত লোকসভা নির্বাচনের আগে। ২০২৪ সালের প্রথম দিনই তৃণমূলের অন্দরে এই মর্মে লড়াই নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয় রাজ্য রাজনীতিতে। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস ১ জানুয়ারি নানা নেতার নানা মন্তব্যে আলোড়িত হয়েছিল শাসকদলের গোষ্ঠী রাজনীতি। রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে দিয়ে দিনের শুরু। পরে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেন কুণাল ঘোষ। সেদিনই নবীন-প্রবীণ বিতর্ক উসকে দেন লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষপর্যন্ত 'বিতর্ক' থামাতে সন্ধ্যায় আপনি বৈঠকে ডাকেন 'নবীন' অভিষেকের সঙ্গ 'প্রবীণ' ফিরহাদ হাকিমকে। সেই সময়ে অভিষেকের প্রতিনিধি হিসেবে সবাইকে আক্রমণ করেছিলেন কুণাল ঘোষ। নবীনদের দাবি নিয়ে দলের অন্দরের 'বিতর্ক' উসকে দেন। অথবা নিজ উদ্যোগে নতুন বিতর্ক তৈরি করেন। সেই বৈঠকের পর মুখপাত্রদের এক্তিয়ার বেঁধে দেওয়ার যে বিষয়টি জানানো হয়েছে, তাতে কুণালের দায়িত্ব পড়েছে বিধানসভা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করার। প্রসঙ্গত, বিধানসভার অধিবেশনের সময় সীমিত। সাংসদ থাকলেও কুণাল কখনো বিধায়ক থাকেননি। তবে কি অভিষেকের চ্যালা কুণালকেও আপনি চুপ করিয়ে দিলেন? পারলে হয়! □

অতিথি কলম

অশ্বিনী বৈষ্ণব

ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতি

'সারা বিশ্বে আপনারাই ভারতের ডিজিটাল দূত। ভোকাল ফর লোকাল-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার আপনারা।' এ বছরই প্রথম ন্যাশনাল ক্রিয়েটার্স অ্যাওয়ার্ড সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই প্রেরণাদায়ী বার্তা ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতির যুগান্তকারী ভূমিকাকে তুলে ধরে। আজ সৃজনশীলতা ও মেধাসম্পদের অধিকারী ভারতীয় নাগরিকরা শুধু গল্প ফেরি করেন না, তাঁরা দেশের নির্মাতা। ভারতের পরিচয়ের অভিজ্ঞান নির্মাণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আঙিনায় এদেশের গতিশীল ও কর্মময় চালচিত্র তুলে ধরছেন এঁরা। গোয়ায় ২০ নভেম্বর শুরু হয়েছিল ভারতের ৫৫তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই)। এবারের থিম 'ইয়ং ফিল্ম মেকার্স— দ্য ফিউচার ইজ নাও', অর্থাৎ, তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা— এখনই উপস্থিত ভবিষ্যৎ। আট দিন ধরে আইএফএফআই-তে বেশ কয়েকশো ছবি দেখানো হয়েছে, তার ফলে শিল্পক্ষেত্রের কুশীলবদের থেকে পরামর্শ ও শিক্ষণের সুযোগ নবীনরা পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পের আঙিনায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের সর্বোচ্চ সৃষ্টি ও শিল্পীদের এই সম্মিলন— উদ্ভাবনা, কর্মসংস্থান এবং সাংস্কৃতিক কূটনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতির সম্ভাবনা ও শক্তির প্রতিফলন ঘটায়।

ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতির ক্রমপ্রসারী দিগন্ত : ভারতে সৃজনধর্মী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহর ৩০ বিলিয়ন ডলার। পরিমাণটি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ২.৫ শতাংশ। দেশের মোট কর্মীগোষ্ঠীর ৮ শতাংশের কর্মসংস্থানের উৎস এই ক্ষেত্র। সিনেমা, গেমিং, অ্যানিমেশন, গান-বাজনা, ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং— নানান শাখায় বিভক্ত এই ক্ষেত্রটি ভারতের সাংস্কৃতিক চালচিত্রের প্রাণময়তাকে প্রতিফলিত করে।

ভবিষ্যৎ তাঁদেরই, যাঁরা উদ্ভাবন করেন, সহযোগিতা করেন এবং সৃজনশীলতার কাজে অবিচল থাকেন। ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতি বিশ্বের সকলের কাছে প্রেরণার আলোকদিশা, অর্থনৈতিক প্রগতির চালিকাশক্তি, সাংস্কৃতিক কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠে সারা বিশ্বে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিক। আসুন, এমনটা নিশ্চিত করা যাক, যাতে ভারতের প্রতিটি সৃজনশীল শিল্পী নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরের বিষয়বস্তু নির্মাতা ও পরিবেশক হয়ে ওঠেন এবং আগামীর রূপরেখার দিশা সারা বিশ্ব জেনে নেয় ভারতেরই কাছ থেকে।

ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং (অর্থাৎ, পরিচিত কোনো মুখকে ব্যবহার করে সামাজিক ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পণ্য ও পরিষেবার বিজ্ঞাপন) ক্ষেত্রের বহর ৩,৩৭৫ কোটি টাকা। দু'লক্ষেরও বেশি সৃজনশীল মানুষ স্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করেন এই ক্ষেত্রে। এই শিল্প আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। গুয়াহাটি, কোচি কিংবা ইন্দোরের মতো আরও অনেক শহর এই সৃজনধর্মী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠছে। ফলে নিশ্চিত হচ্ছে বিকেন্দ্রীকৃত সৃজনধর্মী কর্মকাণ্ড।

সৃজনধর্মী কর্মকাণ্ডের এই গণতন্ত্রীকরণের অন্যতম চালিকাশক্তি হলেন ১১০ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় প্রায় ৭০ কোটি মানুষ। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম মঞ্চ (বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম) এবং ওটিটি পরিষেবা— সৃজক কিংবা নির্মাতাকে সরাসরি আন্তর্জাতিক শ্রোতা ও দর্শকের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়। স্থানীয় বিষয়বস্তু এবং তার বর্ণন গোটা বিষয়টিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। সেই অর্থে ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রটি প্রকৃতই অন্তর্ভুক্তিমূলক।

কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বা বিষয়বস্তু সৃজনকারীদের অর্থনৈতিক সাফল্য অভূতপূর্ব। ১০ লক্ষ ফলোয়ার থাকলে প্রতিমাসে ২০ হাজার থেকে ২.৫ লক্ষ টাকা উপার্জন সম্ভব। এই পরিমণ্ডল আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে লাভজনক হওয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও

সামাজিক বিনিময়েরও একটি বড়ো মঞ্চ হয়ে উঠেছে।

বহুমাত্রিক প্রভাব : সৃজনধর্মী অর্থনীতির প্রভাব শুধু জিডিপি বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সহায়ক নানা শিল্পের সহায়তার মধ্য দিয়ে তা বড়ো ধরনের প্রভাব রাখছে পর্যটন, আতিথ্য এবং তথ্য- প্রযুক্তি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডেও। পাশাপাশি ডিজিটাল মঞ্চগুলি প্রান্তিক মানুষজনের ক্ষমতায়নে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। জোরদার হচ্ছে উন্নয়নযজ্ঞে সমাজের সব শ্রেণীকে যুক্ত করার চেতনা বা সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ভাবনা, বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণের প্রয়াসও। গল্প ফেরি করায় দক্ষতার সুবাদে বিশ্বের আঙিনায় অনুগ্র শক্তি বা সফট্ পাওয়ারে ভারত এখন প্রভাবশালী একটি পক্ষ। বলিউড থেকে আঞ্চলিক সিনেমা, নানা ভাবেই বিশ্বের আঙিনায় নজর কাড়ছে এদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সম্পদ। বিষয়টি ধারাবাহিক উন্নয়নী লক্ষ্যসমূহের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং জীবনচর্যার প্রসারের সুবাদে এক্ষেত্রেও ভারত নিজের দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিচ্ছে জোরালোভাবে।

সরকারের তরফে নানা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ : ভারতের সৃজনমূলক অর্থনীতিকে বিশ্বের আঙিনায় আরও তুলে ধরতে সরকার তিনটি মূল বিষয়ে জোর দিচ্ছে— বিপুল পরিমাণ প্রতিভা সম্পদের (ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি) রক্ষণাবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর প্রসার এবং এই ক্ষেত্রে কর্মরতদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াগত সরলীকরণ। এরই অঙ্গ হিসেবে তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি (আইআইসিটি)। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, সিনেমা, অ্যানিমেশন, গেমিং কিংবা ডিজিটাল শিল্প— সব ক্ষেত্রেই দেশের সাংস্কৃতিক নানান ধারার সম্মিলনের মাধ্যমে বিশ্বের বিনোদন শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়ে ওঠা। চলচ্চিত্র নির্মাণ, আদান-প্রদানমূলক বিনোদনের মতো বিষয়গুলিতে আধুনিকতম প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিষয়বস্তু নির্মাণ (কন্টেন্ট ক্রিয়েশন)-এর ক্ষেত্রে ভারত এক নতুন পথের সন্ধান দিতে চায়।

ওয়ার্ল্ড অডিও-ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট (ডব্লিউএভিইএস) এক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। এই উদ্যোগ মঞ্চ— সৃজনশীল ব্যক্তি, শিল্পক্ষেত্রের কুশীলব এবং নীতি প্রণেতাদের এক জায়গায় এনে দৃশ্যশ্রাব্য চলচ্চিত্র ভাবনা এবং বিনোদন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করার অন্যতম অনুঘটক। প্রধানমন্ত্রীর 'ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া' মন্ত্র অনুযায়ী, ওই আলোচনাচক্রে ভারতীয় সৃজনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মেলবন্ধনের কথা বলা হয়েছে।

সৃজনশীল অর্থনীতির যাবতীয় সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারে ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া নীতি এক অনবদ্য উদ্যোগ। ডব্লিউএভিইএস-এর আয়োজনের পাশাপাশি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া-র এই মন্ত্র অ্যানিমেশন, গেমিং, গান-বাজনা, ওটিটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশে নজর দিয়েছে। বিভিন্ন পেশাদার এবং স্টার্ট-আপগুলির পক্ষ থেকে ১৪ হাজারেরও বেশি নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) ভারতের উদ্ভাবনী শক্তির সার্থক প্রতিফলন।

সামনের পথ— বিশ্বের আঙিনায় ভারত : আইএফএফআই-এর আট দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বার্তা স্পষ্ট হয়েছে যে সারা বিশ্বে সৃজনধর্মী অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের মানবসম্পদ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেবে। ভারত সরকার এই পরিমণ্ডলকে সহায়তাদানে দায়বদ্ধ— নীতি প্রণয়ন, পরিকাঠামোগত বিকাশ এবং উদ্ভাবনমূলক কাজে উৎসাহদানের মাধ্যমে। ভারতের সৃজনশীল নাগরিক সমাজের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে, তা হলো— ফাইভ-জি, ভার্চুয়াল উৎপাদন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে স্বাগত জানানো দরকার। ভৌগোলিক সীমানা নির্বিশেষে কার্যকর মঞ্চগুলিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং বিষয়বস্তু পরিবেশনা এমন হওয়া উচিত, যাতে আন্তর্জাতিক স্তরের দর্শক ও শ্রোতা আকর্ষিত হওয়ার পাশাপাশি ভারতের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় থাকে। ভবিষ্যৎ তাঁদেরই, যাঁরা উদ্ভাবন করেন, সহযোগিতা করেন এবং সৃজনশীলতার কাজে অবিচল থাকেন। ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতি বিশ্বের সকলের কাছে প্রেরণার আলোকদিশা, অর্থনৈতিক প্রগতির চালিকাশক্তি, সাংস্কৃতিক কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠে সারা বিশ্বে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিক। আসুন, এমনটা নিশ্চিত করা যাক, যাতে ভারতের প্রতিটি সৃজনশীল শিল্পী নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরের বিষয়বস্তু নির্মাতা ও পরিবেশক হয়ে ওঠেন এবং আগামীর রূপরেখার দিশা সারা বিশ্ব জেনে নেয় ভারতেরই কাছ থেকে।

(লেখক কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী)

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

বাংলাদেশে আক্রান্ত গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ

বাংলাদেশ যে অনেকদিন আগেই মোল্লাবাদীদের কবজায় চলে গিয়েছে, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছাড়ার পরে এই মোল্লাবাদের রূপটি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। এই তালিকায় নবতম সংযোজন, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে, সেই বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের শীর্ষ নেতৃত্ব চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর গ্রেপ্তারি। তিনি ইসকনের সন্ন্যাসী। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সমাজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন দেশ- বিদেশের সব মহলই। চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর অপরাধ তিনি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে সরব হয়েছেন। 'বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ' এবং 'বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট' নামে দুটি সংগঠন বর্তমানে 'বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের' ব্যানারে সংখ্যালঘুদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করছে আর সেই জোটের মুখপাত্র করা হয়েছে চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে। এরই মধ্যে গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে সমাবেশ করেছিল বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ। সেই সমাবেশে ভাষণও দিয়েছিলেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বেঁচে থাকার দাবিতে সরব হওয়ায় তাঁকে উচিত শিক্ষা দিতে বাংলাদেশ প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে সেই সমাবেশেই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ আনে। অবস্থা বেগতিক দেখে বাংলাদেশের বুকে তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ইসকন বহিষ্কারও করে তাঁদের এই প্রবীণ সন্ন্যাসীকে।

এদিকে সমগ্র ঘটনার রিপোর্টিং করে বাংলাদেশের জনপ্রিয় প্রথম আলো সংবাদপত্র। একাধিক প্রতিবেদনে তারা আদৌ সেদিন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা হয়েছে কিনা কিংবা কোনো চাপের মুখে পরে ইসকন তাঁদের সর্বজনমান্য সন্ন্যাসীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো, তা পাঠকের সামনে তুলে ধরে। এর পরেই মোল্লাবাদীদের রোষ গিয়ে পড়ে সংবাদপত্রটির ওপর। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে 'প্রথম আলো' বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ হয় ঢাকায়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় ৩০০ জন জেহাদি 'প্রথম আলো'র অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো গত ২৫ নভেম্বর। কিন্তু এই বিক্ষোভ যে বাংলাদেশ প্রশাসনের রাষ্ট্রীয় মদতে, তা বুঝতে আর কারওরই বাকি নেই। তাই এই বিক্ষোভে লাগাম পরানো কতটা সম্ভব হবে কিংবা এর সুযোগে মোল্লাবাদীরা কতটা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, সেই প্রশ্ন উঠছে।

উল্লেখ্য যে, 'প্রথম আলো' কিন্তু বরাবরই প্রতিবাদী। বিভিন্ন সময়ে সরকারের সমালোচনা করার জন্যে শেখ হাসিনা সরকারের আমলেও একাধিকবার রোষের মুখে পড়তে হয়েছে 'প্রথম আলো'কে। এরপর গত জুলাই মাসের জেহাদি অভ্যুত্থানের সময় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকার জেরে প্রথম আলোর অনলাইন পোর্টালও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে এখন 'প্রথম আলো'র বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা বর্তমানে হাসিনার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট! একটা সময় এই প্রথম আলোকেই 'দেশের শত্রু' আখ্যা দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে প্রথম আলো এই দেশের কখনোই স্থিতিশীলতা চায় না। যাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে তাঁরা এখন দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্তদের পক্ষে কথা বলছে। আওয়ামি লিগ, গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশের জনগণের শত্রু এই দৈনিক পত্রিকা।'

এই আবহেই সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বন্ধের দাবি তুলছে বাংলাদেশের মোল্লাবাদী অংশ। যদিও হাসিনাকে সমর্থন করার বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন 'প্রথম আলো' সংবাদপত্রের কার্যকরী সম্পাদক সজ্জাদ শরিফ। বর্তমান পরিস্থিতি এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা এএফপি-কে শরিফ বলেন, 'আমরা ধারবাহিকভাবে আমাদের কাজের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রেখেছি এবং ভবিষ্যতেও তা করতে থাকব।' এদিকে শুধু ঢাকাতেই নয়, রাজশাহি ও চট্টগ্রামেও প্রথম আলোর অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন মোল্লাবাদীরা বলে খবর। মোল্লাবাদীরা ওই সংবাদপত্রটিকে ইতিমধ্যেই 'ভারতের বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট' ও 'ইসলাম বিরোধী' বলে দাগিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ওই সংবাদপত্রটির ওপর প্রশাসনিক সন্ত্রাস নেমে আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

সরকার মুখে যাই বলুক, সংখ্যালঘু সুরক্ষার প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার কোনোমতেই আন্তরিক নয়। কারণ বর্তমান বাংলাদেশ প্রশাসন পুরোপুরি মোল্লাবাদীদের কবজায় সেটি এখন 'ওপেন সিক্রেট'।

সরকার মুখে যাই বলুক, সংখ্যালঘু সুরক্ষার প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার কোনোমতেই আন্তরিক নয়। কারণ বর্তমান বাংলাদেশ প্রশাসন পুরোপুরি মোল্লাবাদীদের কবজায় সেটি এখন 'ওপেন সিক্রেট'। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে ও সংখ্যালঘু-নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভারতের কিছু সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলে কূটনীতিবিদরা মনে করেন। বিশেষ করে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেখানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে বহুবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক মহলে দরবার করেছেন। □

বেলডাঙার ঘটনা : পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের একটি গুরুতর সতর্কবার্তা

পশ্চিমবঙ্গেও যে অঞ্চলে হিন্দু সংখ্যা কমেছে, সেখানে সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা স্থানীয় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের হাতে চলে এল। কারণ গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী যার ক্ষমতা যত বেশি তার শক্তি তত বেশি। এখন প্রশ্ন, বেলডাঙা কি হিন্দুদের ঘুম ভাঙাতে পারবে?

বিপ্লব বিকাশ

মনে করুন, আপনি নিজের বাড়িতে বসে নিত্যদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম করছেন। হঠাৎ খবর এল, পাশের এলাকায় সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১৬ নভেম্বর বেলডাঙার মানুষ এরকমই দুঃসহ ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার এই ছোট্ট শহরে ভগবান কার্তিকের পূজাকে ঘিরে এমন এক উত্তেজনা ছড়ায় যা মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকাকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে। পরিস্থিতি এমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে যে, প্রশাসন বাধ্য হয় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিতে। এবার ভাবুন, যে এলাকায় বিধায়ক মুসলমান, সাংসদও মুসলমান আর প্রশাসনের উপর পক্ষপাতের অভিযোগ রয়েছে। সেখানে কি সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব? বেলডাঙার ঘটনায় বহু হিন্দুর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, সম্পত্তি লুঠ করা হয় এবং অনেককে বাধ্য করা হয় নিজের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য এলাকা ছেড়ে চলে যেতে। এর পরে যা ঘটেছে তা আরও আশ্চর্যজনক। স্থানীয় প্রশাসন একতরফা পদক্ষেপ নিয়ে অভিযোগগুলি উপেক্ষা করে ঘটনাটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বেলডাঙার সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। গত ২২ নভেম্বর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর মতে, এই ঘটনা পুলিশ-প্রশাসনের চরম ব্যর্থতার প্রতিফলন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, "ঘটনাটি সেশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরেও স্থানীয় পুলিশ সময়মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি এবং দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে।" তিনি বলেন, "লোকসভা নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরে রামনবমী উদ্‌যাপনের সময়ও এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমার মতে, বেলডাঙ্গা ও শক্তিপুরের উভয় ঘটনাই জেলার মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টির একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ।" তিনি আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যিনি প্রায় প্রতিটি বিষয়ে মন্তব্য করেন, বেলডাঙা ও শক্তিপুরের ঘটনায় তার নীরবতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে অন্তত সাধারণ মানুষের প্রতি শান্তির বার্তা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা তাঁর নীরবতাই দেখেছি।" এই নীরবতা শুধু মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বজ্ঞানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে না, বরং এর দ্বারা প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের একটি স্পষ্ট বার্তা পৌঁছাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে।

এটা কি গণতন্ত্রের নীতিগুলি লঙ্ঘন নয়? কেন এমনটা ঘটছে? এর উত্তর লুকিয়ে আছে বেলডাঙার বিন্যাসের মধ্যে। ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী, এখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর এই সংখ্যা ক্রমশ বড়ে চলেছে। এর প্রভাব ভোটের ফলাফলেও স্পষ্ট। এই ধরনের এলাকায় ধর্মীয় জনসংখ্যার ভারসাম্য কেবল রাজনৈতিক সমীকরণই বদলে দিচ্ছে না, বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতার উপরও প্রশ্ন তুলছে। এটা মনে করা ভুল হবে, বেলডাঙার হিংসা শুধুই একটি সাম্প্রদায়িক ঘটনা। এটি সেই গভীর সমস্যার অংশ, যা আমাদের গণতন্ত্রকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের এই ধরনের এলাকাগুলি যেখানে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা একতরফা হয়ে উঠেছে, সেখানে সংখ্যালঘুদের (যারা এখন হিন্দু) জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ কতটা অবশিষ্ট আছে? জনসংখ্যার পরিবর্তন শুধুমাত্র পরিসংখ্যানের খেলা নয়; এর গভীর প্রভাব আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। ১৯৫১ সালে রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৯.৮৫ শতাংশ। ঠিক সাত দশক পরে, ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এটি বেড়ে হয়েছে ২৭ শতাংশ। এখন, ২০২৪ সালে, বিশেষজ্ঞদের অনুমান, অনুযায়ী এই সংখ্যা ৩০ শতাংশেরও বেশি হয়ে গিয়েছে।

এই পরিবর্তন শুধুমাত্র শতাংশ বৃদ্ধি নয়; এটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে মুর্শিদাবাদ (৬৬.২৮ শতাংশ), মালদা (৫১.২৭ শতাংশ) ও উত্তর দিনাজপুর (৪৯.৯২ শতাংশ) জেলার মতো এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাধিক্য হয়ে উঠেছে। এটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক জন্মহার বৃদ্ধির ফল নয়। এর পিছনে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা পাঁচ সদস্যের সংবিধান বেঞ্চকে জানিয়েছিলেন যে, কেন্দ্র সরকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষার

ফঃ ২

জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ২,২১৭ কিমি দীর্ঘ সীমান্তের মধ্যে মাত্র ৮১.৫ শতাংশে কাঁটাতার দেওয়া হয়েছে। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি অধিগ্রহণে সহযোগিতা করে এবং সীমান্ত সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রদান করে, তবে কেন্দ্র সরকার দ্রুত কাজ সম্পন্ন করবে। কিন্তু যেখানে এখনো পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই, সেই অংশগুলিতে সীমান্তের 'অস্পষ্টতা' স্থানীয় জনসংখ্যার ভারসাম্যকে ব্যাহত করছে। একই সঙ্গে এটি রাজ্যের সামাজিক , সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে। একদিকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিতে ভোটব্যাংক রাজনীতি প্রসারিত হচ্ছে, অন্যদিকে হিন্দুরা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

যদি সময়মতো হিন্দুসমাজ জনসংখ্যা, সীমান্ত অঞ্চলগুলির সুরক্ষা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের প্রতি গুরুত্ব না দেয়, তবে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের চতুর কৌশলের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ইতিমধ্যেই এখানকার গণতান্ত্রিক কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। রাজনীতিতে মুসলমান ভোটব্যাংকের গুরুত্ব দ্রুত বাড়ছে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০১২ সালে ইমাম ও মুয়াজ্জিমদের মাসিক ভাতা প্রদানের ঘোষণা হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এমনকী সরকারি কর্মচারীদের জন্য ভাতা ও বোনাস প্রদানের পরিমাণ, সময় ও দ্রুততার মধ্যে বৈষম্যের অভিযোগও বিধানসভার বিরোধী দল নেতা প্রকাশ্যে এনেছিলেন।

২০২১ সালের বিধানসভার নির্বাচনে এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে তৃণমূলের পক্ষে ভোট পড়েছে। এই মেরুকরণ দেখিয়েছে যে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন কীভাবে রাজ্যের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কারণে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও বেড়েছে। ২০১৭ সালের বসিরহাট দাঙ্গা এর একটি বড়ো উদাহরণ। যেখানে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের কারণে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল এবং হিন্দুদের দোকান ও বাড়িঘরে হামলা হয়েছিল। ২০২১ সালে কোচবিহারের শীতলকুচিতে নির্বাচনের সময় ঘটে যাওয়া ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে জনসংখ্যাগত ও রাজনৈতিক মিশ্রণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। এবারের দুর্গাপূজা ও কালীপূজাতে কয়েকটি জায়গায় পূজা বন্ধ করা হয়েছে বা কলকাতা ও হাওড়া শহরাঞ্চলে মণ্ডপে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এইসব ঘটনা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠাতার কারণে সম্ভব হয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার থাকার জন্য শাসকদল তোষণ করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে রাজ্যের অনেক জেলায় মুসলমান জনসংখ্যার প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ (৬৬.২৮ শতাংশ), মালদা (৫১.২৭ শতাংশ) ও উত্তর দিনাজপুর (৪৯.৯২ শতাংশ) জেলায় মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩৫.৫৭ শতাংশ), বীরভূম (৩৭.০৬ শতাংশ) ও নদীয়া (২৫.৪১ শতাংশ) জেলায় তাদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এমনকী কলকাতা মহানগরেও মুসলমান জলসংখ্যা ২০.৬ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কোনো অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যা ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, তবে তারা সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভাবশালী ভূমিকা নিতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ২০ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে তিনটি জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি। এই জেলাগুলিতে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনীতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, সেকুলার ও বামপন্থীরা কখনোই এ কথা বলেন না যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উচিত সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। এই জেলাগুলির কিছু অংশে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু এবং হিন্দুরা সংখ্যালঘু। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ ও মালদায় বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের বড়ো প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই জেলাগুলির ভৌগোলিক অবস্থান এবং সীমান্তের নিরাপত্তার অভাবের কারণে স্থানীয় জনসংখ্যার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটছে, যা রাজ্যের সামগ্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।

আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে 'সংখ্যালঘু' সংজ্ঞাকে স্পষ্ট করার। যাতে গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং সাম্প্রদায়িক ভারসাম্যের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আজকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। ২৩টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলায় মুসলমানদের প্রভাবই সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। আজকে যারা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা কতদিন থাকবেন সেটা সময় বলবে, কিন্তু হিন্দু সমাজের যা ক্ষতি করে চলেছেন, তা কি পূরণ করা সম্ভব হবে? বর্তমান পরিস্থিতিতে বলা যেতে পারে যে, অনেক সমস্যার মধ্যে এটাও একটা বড়ো সমস্যা যে, হিন্দু সমাজ নিজের সব সমস্যার জন্য পুলিশ-প্রশাসন ও সরকারের উপর নির্ভর করে থাকে। ধীরে ধীরে সংখ্যালঘুর নামে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে চলেছে। গ্রামে সমস্যা হলে লোকেরা শহরের উদ্দেশে নিরাপত্তার খোঁজে পলায়ন করছে বা অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময় মানুষ ভাবে যে, আমি এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গেলে আমার পরিবার সুরক্ষিত থাকবে, কিন্তু সেটা কি সত্যিই কোনো সমাধানের রাস্তা? পূর্ববঙ্গ থেকে যারা এপারে এসেছেন তারাও তো ভেবেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে নিরাপত্তা পাবেন এবং শান্তিতে থাকতে পারবেন। কিন্তু এরফলে দেখা গেল পূর্ববঙ্গে যারা থেকে গেলেন তাদের সংখ্যা আরও কমে গেল এবং তাদের উপর অত্যাচার বেড়ে গেল।

পশ্চিমবঙ্গেও যে অঞ্চলে হিন্দু সংখ্যা কমেছে, সেখানে সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা স্থানীয় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের হাতে চলে এসেছে। কারণ গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী যার ক্ষমতা যত বেশি তার শক্তি তত বেশি। এখন প্রশ্ন, বেলডাঙা কি হিন্দুদের ঘুম ভাঙাতে পারবে?

স্বাধীনতাযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ
ক্ষুদিরাম বসু

রাজদীপ মিশ্র

বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর লেখা দিয়েই বর্তমান প্রবন্ধ শুরু করা যাক— "একদিন সন্ধ্যেবেলা আমি মেদিনীপুরের কোনো নির্জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তা থেকে একটু দূরে কয়েকজন ছেলে বসেছিল। তার মধ্যে থেকে একটি ছেলে দৌড়ে এসে আমার সাইকেল আটকে অত্যন্ত সহজভাবে বলেছিল, তাকে একটি রিভলবার দিতে হবে। তখন তার বয়স আন্দাজ চৌদ্দ বছর।"

চৌদ্দ বছরের এই ছেলেটির নাম ক্ষুদিরাম বসু। ভারতমাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য যাঁরা 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু। এই নির্ভীক চিত্ত যুবকদের সঞ্জীবনীমন্ত্র ছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'। এই মন্ত্র যাঁরা জীবনের মূলমন্ত্র করেছিলেন, তাঁদের ছিল নিঃশেষে প্রাণ দান করার সংকল্প।

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও ত্রৈলোক্যনাথ বসুর তিনটি মেয়ে। এরপর দুই পুত্রের জন্ম হলেও তাদের অকালমৃত্যু হয়। মেদিনীপুর শহরে তহসিলদার রূপে নিযুক্ত হওয়ায় ত্রৈলোক্যনাথ মেদিনীপুর শহরে সপরিবারে বাস করতে থাকেন। মেদিনীপুর শহরের হবিবপুর এলাকায় প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী এক পুত্রসন্তানের জন্য হত্যে দিয়ে পড়ে থাকেন। তৃতীয়রাত্রে দেবীর স্বপ্নাদেশ পান, তিনি এক সুসন্তান লাভ করবেন কিন্তু সে ছেলে দীর্ঘজীবী হবে না। ৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৯ সাল, মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় জন্ম হয় সেই পুত্রের। দেবীর দয়ায় সব পেয়েও হারানোর দুঃখে সবাই মনমরা। তৎকালীন একটা প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, যে নারীর সন্তান বাঁচে না, তার কাছ থেকে অন্য কেউ সন্তান কিনে নিলে সেই সন্তানের নাকি মৃত্যুযোগ কেটে যায়। সে সন্তান দীর্ঘজীবন লাভ করে। তাই জন্মমুহূর্তেই তিনমুঠো খুদ দিয়ে মায়ের কাছ থেকে সেই ছেলেকে কিনে নিলেন বড়দিদি অপরূপা। খুদ দিয়ে কেনা বলে ছেলের নাম রাখা হলো ক্ষুদিরাম। মাত্র দু' বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু এবং তার কিছুদিন পরই বাবার মৃত্যু হয়। মা-বাবা হারানোর ব্যথা বোঝার মতো বয়স তখন ক্ষুদিরামের হয়নি। তবুও সে অভাব তাকে বুঝতে দেননি বড়দিদি অপরূপা। সাত বছর বয়সে গ্রামের গিরীশ মুখার্জির পাঠশালায় ভর্তি করা হলো ক্ষুদিরামকে।

১৯০১ সালে চাকরির প্রয়োজনে ক্ষুদিরামের জামাইবাবু অমৃতলাল গ্রাম ছেড়ে সপরিবারে তমলুকে আসেন। সেখানে চতুর্থ শ্রেণীতে হ্যামিলটন স্কুলে ভর্তি করা হয় ক্ষুদিরাম ও তাঁর ভাগ্নে ললিতমোহনকে। ক্ষুদিরাম একদিকে ছিল ডানপিটে, বেপরোয়া, একগুঁয়ে; আবার অন্যদিকে পরোপকারী, বন্ধুবৎসল ও স্পষ্টবাদী। খুব অল্প সময়ে সে সহপাঠী ও শিক্ষকদের মন জয় করে নেয়। ভাগ্নে ললিতমোহনের কাছ থেকে শোনা যায়, বহুবার বহু বিষধর সাপের মুখোমুখি পড়েও ভয়ে পালিয়ে যায়নি; বরং বিদ্যুদ্‌বেগে লাফ মেরে জাপটে ধরত সাপের লেজটা, তারপর বোঁ বোঁ করে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে একসময় ছুঁড়ে ফেলত বহু দূরে। তমলুক শহরে একবার কলেরা দেখা দিল মহামারীরূপে। জীবনের পরোয়া না করে কিশোর ক্ষুদিরাম ঝাঁপিয়ে পড়ল রোগীদের সেবা-শুশ্রূষায়। ক্ষুদিরামের ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে দিদি অপরূপা বলেন— 'খুব দুরন্ত, লেখাপড়াতে মন নেই, শুধু খেলা আর খেলা। আবার সেদিন পড়ার ইচ্ছা হতো, সেদিন যেন তপস্যার মতো বসতো। মাস্টার আশু রায়ের যত রকম শাস্তি ছিল, তার সবই হার মেনেছিল ক্ষুদিরামের একগুঁয়েমির কাছে।'

সরকারি চাকরির সুবাদে অমৃতলাল বদলি হলেন মেদিনীপুর শহরে। ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলো। স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক রামচরণ রায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। ব্যায়ামশিক্ষা ও শরীরচর্চায় হয়ে উঠল সবার সেরা। ইতিহাসের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ইতিহাস পড়ানোর সূত্রে অত্যাচারী ইংরেজদের শয়তানি ও দুরভিসন্ধির কথা ছাত্রদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন এবং ছাত্রদের মনে দেশপ্রেমের প্রেরণা সঞ্চার করতেন।

তখন ইংরেজ বিরোধী আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। মারের বদলে দিতে হবে পালটা মার। অরবিন্দ ও বারিন ঘোষের উদ্যোগে কলকাতার মানিকতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিপ্লবী

গুপ্ত সমিতি। দায়িত্বভার ছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, তাঁর ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং হেমচন্দ্র কানুনগোর ওপর।

'আমি দেশের কাজ করতে চাই মাস্টারমশাই'--- শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথকে মনের কথা বলার পর তিনি ক্ষুদিরামকে নিয়ে এলেন সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। সত্যেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন ক্ষুদিরামের দীক্ষাগুরু। ক্ষুদিরামকে একদিন তিনি বললেন— 'আজ তোকে সে কথা বলব— শপথ কর, কারোর কাছে বলবি না।' নির্দ্বিধায় শপথ নিলেন ক্ষুদিরাম। সত্যেন্দ্রনাথ বললেন— 'দেশের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে এমন ছেলেদের নিয়ে আমি দল গড়ছি। তোকে আমাদের চাই।' মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্ষুদিরামের।

শুরু হলো ক্ষুদিরামের জীবনের নতুন অধ্যায়। গুপ্ত সমিতির সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হলেন তিনি। স্কুল পালিয়ে গুপ্ত সমিতির বিভিন্ন আখড়ায় ঘুরতে থাকলেন। অল্পদিনের মধ্যেই লাঠি, তলোয়ার ও কুস্তিতে ক্ষুদিরাম হয়ে উঠলেন সবার সেরা। এছাড়াও গোপনে পেতে লাগলেন বন্দুক ও রিভলবার চালানোর শিক্ষা। দেশের কাজে মনেপ্রাণে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছেন তিনি। সারা জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন ব্যায়াম সমিতি ও আখড়া পরিচালনার কাজে। রণপায়ে চড়ে কখনো পৌঁছে যাচ্ছেন মুগবেড়িয়া, কখনো মহিষাদল, কখনো মেদিনীপুরে। প্রতিদিনই একাধিক আখড়ায় গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের লাঠি, ছোরা, তলোয়ার খেলা শেখাচ্ছেন। ক্ষুদিরামের সাহস ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে মেদিনীপুর শহরের প্রতিটি আখড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলার অন্যান্য আখড়াতেও স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ও উৎসাহ দুইই বাড়তে লাগল।

১৯০৫ সালে বঙ্গবঙ্গের প্রতিবাদে গর্জে উঠল সারাদেশ। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে মেদিনীপুরে তৈরি হলো বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যার অগ্রণী ভূমিকায় ক্ষুদিরাম । ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরের পুরাতন জেলের মাঠে একটি কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর আসর বসে। সেখানে ক্ষুদিরাম 'সোনার বাংলা' নামে প্রচার পত্র বিলি করার সময় এক পুলিশ বাধা দিলে তার নাকে সপাটে এক ঘুঁসি মেরে রক্ত বরে করে চম্পট দেয়। ক্ষুদিরামের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। পরে ক্ষুদিরাম আত্মসমর্পণ করে। ক্ষুদিরামই প্রথম বিপ্লবী যার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার প্রথম রাজদ্রোহের মামলা করে। 'আসামি নেহাতই ছেলেমানুষ এবং নিজের বিচারে একাজ করেনি'— এই বিবেচনায় মুক্তি পায় ক্ষুদিরাম।

সাংগঠনিক কার্যবিস্তারের জন্য ক্ষুদিরামকে নিরন্তর বিভিন্নস্থানে যেতে হয়। জকপুর, বালিচক হয়ে সবং থানার বেলকীগ্রামে এসে হাটেবাজারে সভা করে সাধারণ মানুষকে বিদেশি পণ্য বর্জনে উৎসাহিত করে। সবং থেকে আসে মুগবেড়িয়া। সেখানে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির পৃষ্ঠপোষক দিগম্বর নন্দের বাড়িতে ওঠে। মুগবেড়িয়াকে কেন্দ্র করে আশেপাশের বহু স্থানে ব্যায়ামচর্চা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ক্ষুদিরামের নেতৃত্বে বহু স্থানীয় যুবক স্বেচ্ছাসেবক রূপে হাটেবাজারে বিলাতি পণ্য বর্জনের সভা করেন, পিকেটিং করেন। সন্ধ্যায় ব্যায়ামের আখড়াগুলিতে লাঠি, ছোরা, তলোয়ার খেলা শিক্ষা দেন। কিন্তু শুধু লাঠি, ছোরা আর তলোয়ার দিয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাজ শক্তির সঙ্গে সম্মুখ সমরে সফল হওয়া যায় না। তাই বিপ্লবী কর্মীদের অস্ত্রশিক্ষাও দেওয়া দরকার। সেই উদ্দেশ্যেই দিগম্বরবাবু বিপ্লবীদের বন্দুক চালানোর শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাঁকুড়ার ফুলকুসমার কাছে ছেঁদাপাথর গ্রামে তাদের কাছারি বাড়িটি বিপ্লবীদের ব্যবহারের জন ছেড়ে দিলেন। কাছারি বাড়ির সামনে একটি পরিত্যাক্ত কুয়োর মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো লুকিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হতো। ক্ষুদিরাম তাঁর অন্যান্য কাজের ফাঁকে বিপ্লবী কর্মীদের বন্দুক ও রিভলবার চালানো শিক্ষা দিত।

স্বদেশি আন্দোলনকে দমন করতে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি মিস্টার কিংসফোর্ড। সে সকলের ওপর অকথ্য নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু করেছে। জাতীয়তাবাদী পত্র পত্রিকা--- 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি' প্রভৃতির সম্পাদক ও কর্মীদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করছেন। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। কিংসফোর্ডের এজলাসে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা চলছে। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অন্যতম সম্পাদক তথা প্রখ্যাত দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে আদালত অবমাননার দায়ে তাঁকে ছ' মাসের কারাদণ্ডের আদেশ শোনানো হয়। সমবেত জনতা বিপিনচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দেওয়ার ইংরেজ পুলিশবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠি চার্জ করে।

পুলিশের এই অমানুষিক অত্যাচার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ১৫ বছরের কিশোর সুশীল সেন। উত্তেজিত হয়ে এক পুলিশ সার্জেন্টকে ঘুঁষি মেরে মাটিতে ফেলে দিল। অবিলম্বে ধরা পড়ল। পরের দিন কিংসফোর্ডের আদালতে হাজির করা হলে রায় দেওয়া হলো— 'ওর যত বছর বয়স, তত ঘা বেত লাগাও ওর পিঠে।' গুনে গুনে ১৫ ঘা বেত পড়ল। যতবারই বেত পড়ে ততবারই সে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করে। শেষে যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এই আচরণে শিউরে উঠল দেশের মানুষ।

কয়েকদিন পর, ২৮ আগস্ট কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হলো সুশীলের সংবর্ধনা সভা। বীরবালক সুশীলকে উপহার দেবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠালেন স্বর্ণপদক। শোভাযাত্রা সহকারে হাজার হাজার জনতা সুশীলকে নিয়ে চলল সভাস্থলে। কলকাতার আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো আবেগপ্লুত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের রচিত সংগীতের ছন্দে : 'যায় যাবে জীবন চলে, জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে।'

বিপ্লবীদের এক গোপন সভায় কিংসফোর্ডের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হলো। প্রথম চেষ্টা হলো 'বইবোমা' পাঠিয়ে, কিন্তু কপালজোরে বেঁচে যায় কিংসফোর্ড। এবার তাকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় উনিশ বছরের প্রফুল্ল চাকীর উপর। পূর্ববঙ্গের বগুড়া জেলার প্রফুল্ল। তার সঙ্গী ও সহযোগী হিসেবে স্থির করা হলো ক্ষুদিরাম বসুকে।

হেমচন্দ্র কানুনগো ও উল্লাসকর দত্তের

বোমা বানানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় দুটি রিভলবারও জোগাড় হয়ে গেছে। নেতৃত্বের নির্দেশে দুই বিপ্লবী তখন চূড়ান্ত প্রস্তুতি প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ১৯০৮ সালের ১৮ এপ্রিল মেদিনীপুরের বাড়ি থেকে শেষ বিদায় নিলেন ক্ষুদিরাম। বন্ধুরা একদিন দেখল, ক্ষুদিরাম দোকান থেকে জুতো কিনছে। তারা তো রীতিমতো বিস্মিত। কারণ তারা জানত ক্ষুদিরাম বেশ কিছুদিন আগে থেকে জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছে। তাই বন্ধুরা ক্ষুদিরামকে প্রশ্ন করল— 'জুতো কী হবে রে?' ক্ষুদিরাম হেসে উত্তর দিল— 'বিয়ে করতে যাচ্ছি, বিয়েতে নতুন জুতো পরতে হবে তো!' তাঁর উত্তর শুনে বন্ধুরা আবার কিছুটা বিস্মিত হলো। কারণ ক্ষুদিরাম বলত, সে কখনো বিয়ে করবে না। বন্ধুদেরও সংসার না করে দেশের কাজ করার কথা বলত। কিন্তু ক্ষুদিরামের সহজ সরল কথাবার্তা তারা অবিশ্বাস করতে পারল না। তাই ক্ষুদিরামকে তারা জিজ্ঞেস করল— 'কোথায় যাচ্ছিস রে বিয়ে করতে?'

—'উত্তরে।'

—'বিয়ে করে কবে ফিরবি?'

ক্ষুদিরাম একটু হাসল, তারপর বলল— 'কী জানি ফিরব কিনা, শুনছি আমায় ঘরজামাই রাখবে।' জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কী স্বচ্ছ, অনাবিল কৌতুক!

কিংসফোর্ড ততদিনে বদলি হয়েছে মজফ্ফরপুরের জেলা জজরূপে। হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন— 'তাকে (ক্ষুদিরামকে) বুঝিয়ে পড়িয়ে প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে মজফ্ফরপুর পাঠানো হলো। এ কাজের ভার পেয়ে তারা যে কৃতার্থ হয়ে গেছিল, তাদের কথায় ও ভাবে তা প্রকাশিত হয়েছিল।'

মজফ্ফরপুর পৌঁছে এক ধর্মশালায় আশ্রয় নিল দুই তরুণ। কিংসফোর্ডের বাড়ি ও গতিবিধি সম্পর্কে ভালোভাবে খবর নেওয়া শুরু করল তারা। কিংসফোর্ডের বাড়ির কাছেই. ইউরোপীয়ান ক্লাব। প্রতি সন্ধ্যায় গাড়িতে ক্লাবে আসেন কিংসফোর্ড। আবার আটটা নাগাদ ফেরেন।

এল বহু প্রতীক্ষিত সেই দিন। ৩০ এপ্রিল, ১৯০৮, বৃহস্পতিবার। রাত আটটা। ফেরার সময় হয়েছে কিংসফোর্ডের। রাতের অন্ধকারে অপেক্ষমান দুই তরুণ। ক্ষুদিরামের হাতে সেই বিখ্যাত বোমা, পকেটে রিভলবার। প্রফুল্লের কাছে একটি পিস্তল। গাড়ি এগিয়ে আসতে দেখেই বোমা ছোঁড়ে ক্ষুদিরাম। দাউ দাউ করে গাড়ি জ্বলছে। ভাগ্যবান কিংসফোর্ড, ওই গাড়িতে তিনি ছিলেন না, ছিলেন দুই ইংরেজ মহিলা— মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা। কিন্তু দুই বিপ্লবী বুঝতে পারল কিংসফোর্ড শেষ। জুতো খুলে রাতের অন্ধকারে দুজন খালিপথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। কিছুটা আসার পর তারা ঠিক করল যে, দু'জনের একসঙ্গে থাকা ঠিক নয়। প্রফুল্লকুমার চললেন সমস্তিপুরের দিকে। আর ক্ষুদিরাম উলটোপথে। ওয়াইনি স্টেশনে সাদা পোশাকের দুই কনস্টেবলের ক্ষুদিরামকে দেখে সন্দেহ হলো। তারা ক্লান্ত-বিধ্বস্ত ক্ষুদিরামকে ধরে ফেলল। ধস্তাধস্তির সময় ক্ষুদিরামের পকেট থেকে রিভলবারটি পড়ে গেল। বিকেলের ট্রেনে ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসা হলো মজফ্ফরপুরে। অন্যদিকে সমস্তিপুর স্টেশনে ধরা পড়ার উপক্রম হলো প্রফুল্ল চাকীর। কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা দেবার ছেলে নয় প্রফুল্ল। নিজের কাছে থাকা পিস্তলের গুলি নিজেরই বুকে চালালেন। বীরপুত্রের রক্ত নিবেদিত হলো দেশজননীর পূজাবেদীমূলে।

১৯০৮ সালের ১ মে মজফ্ফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের কাছে ক্ষুদিরাম সকল সত্য স্বীকার করল। শুরু হলো বিচারের নামে প্রহসন। ১৯০৮ সালের ৮ জুন থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত অতিরিক্ত সেশন জজ কনভাসের এজলাসে বিচারের অন্তিম পর্ব চলল। বিচারের ফলাফল জানার জন্য সারাদেশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। জজসাহেব বিচারের রায় পড়ে শোনালেন, প্রাণদণ্ড। কিন্তু ক্ষুদিরাম নির্বিকার, শান্ত। জজসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'যে রায় দেওয়া হলো তা তুমি বুঝতে পেরেছো তো?' হাসিমুখে মাথা নেড়ে ক্ষুদিরাম বলল, 'হ্যাঁ বুঝেছি।'

'তোমার কিছু বলার আছে?'

ক্ষুদিরাম বলল, 'আমাকে একটা কাগজ কলম দিলে বোমাটা এঁকে দেখিয়ে দিতে পারি। বোমার সম্পর্কে অনেকেরই কোনো ধারণা নেই'।

বিচারক কঠোর মুখে জানালেন, 'না, তা হতে পারে না।'

ক্ষুদিরাম বলল, 'দেশের তরুণদের জন্য বোমা তৈরির সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। সমস্ত বিচারক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ওহ্, নো, নেভার। তোমাকে কিছু বলতে দেওয়া হবে না।' মৃদু হাসল ক্ষুদিরাম।

হাইকোর্টে আপিল করার জন্য ক্ষুদিরামকে সাতদিন সময় দেওয়া হলো। ক্ষুদিরাম চাননি। অনেকের অনেক পীড়াপীড়িতে শেষকালে রাজি হলেন। কিন্তু হাইকোর্ট তো ইংরেজদেরই! সব যুক্তি শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হলো। আপিল অগ্রাহ্য করে প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত বহাল রাখল বিচারপতিরা। ফাঁসির দিন ধার্য হলো ১১ আগস্ট, ১৯০৮, মঙ্গলবার।

ফাঁসির সময় কারাপ্রাঙ্গণে অনুমতি সাপেক্ষে দুজন উপস্থিত ছিলেন--- উপেন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গী ক্ষেত্রনাথ। উপেন্দ্রনাথের রচনায়— 'একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিশ। কথাটা ঠিক বলা হইল না। ক্ষুদিরামই আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছিল। শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিয়া, কারাবাসকালীন বর্ধিত চুলগুলি আঙুল দিয়া বিন্যস্ত করিয়া নিকটবর্তী দেবমন্দির হইতে প্রহরী কর্তৃক আনীত চরণামৃত পান করিয়া আর একটিবার আমাদিগের দিকে চাহিল, তারপর দৃঢ় পদবিক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।'

শোনা যায়, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্ভীক অচঞ্চল ক্ষুদিরাম ফাঁসুড়েকে প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা, তোমরা ফাঁসির দড়িতে মোম দাও কেন?' গলায় দড়ি পরানোর সময় নিষ্কম্প কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দড়িটা ঠিক করে পরাও'।

কী অসাধারণ এক চরিত্র! মৃত্যুর প্রতি কী নিদারণ উদাসীনতা! মৃত্যুভয়কে এমন অবহেলায় জয় করতে পেরেছিলেন বলেই তো ক্ষুদিরাম মৃত্যুঞ্জয়ী। □

শ্রীঅরবিন্দ

বিপ্লব থেকে বিধাতার সন্ধানে

সুজিত রায়

ঘটনাস্থল : ৪ নম্বর শ্যামপুকুর লেন, কলকাতা। সময় রাত আটটা। দোতলার একটি ঘরে বসে অরবিন্দ লেখালেখি করছিলেন। হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করলেন রামবাবু। রামচন্দ্র মজুমদার। বয়স বছর তিরিশ। 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম্ম' পত্রিকার সহযোগী কর্মী। রামবাবু অরবিন্দকে বললেন— ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। পুলিশের হুলিয়া। যে কোনো সময় পুলিশ আসবে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে।

খবরটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু তবুও নিমেষে ঘরের আবহাওয়া বদলে গেল। সবাই চুপ। যেন নিমেষে অখণ্ড নীরবতা গ্রাস করল কর্ম্মমুখর পরিবেশকে।

অরবিন্দও চুপ। চোখ বুজে যেন কিছু ভাবছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ, খুললেন। বললেন, আমি চন্দননগরে নাব। রামবাবু হতচকিত।

—কেন? কখন যাবেন?

—এক্ষুনি— এই মুহূর্তে।

অরবিন্দ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়লেন। রামবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন উত্তর কলকাতার পথ ছেড়ে চন্দননগরের পথে। অনেকে বলেন, অরবিন্দ ঘোষ, যিনি অদূর ভবিষ্যতে ঋষি অরবিন্দ নামে পরিচিত হবেন এবং আশ্রম গড়বেন পণ্ডিচেরীর সমুদ্রতীরে, তিনি নাকি পুলিশের গ্রেপ্তারি এড়াতেই ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে পালিয়ে ছিলেন। কারণ দীর্ঘকাল প্রায় শৈশব থেকেই তিনি ইউরোপবাসী এবং জীবনের একটি বড়ো অংশ তাঁর কেটেছিল ফ্রান্সে। তাই দেশে ফেরার পরেও চন্দননগরের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক।

অনেকে বলেন, শ্রীঅরবিন্দ জেলবন্দি হওয়ার ভয়ে ব্রিটিশ পুলিশকে এড়িয়ে ফরাসি প্রশাসনের এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু এই নেতিবাচক সমালোচনা ওইসব সমালোচকদের মানুষ চেনার অক্ষমতাকেই প্রমাণ করে। কারণ, তাঁরা জানেন না, তৎকালীন সময়ে কঠিন সিভিল সার্ভিস (বর্তমানে আইএএস) পরীক্ষায়, অত্যন্ত ভালো ফল করেও সেনার চাকরির লোভ ত্যাগ করে তিনি ভারতবর্ষে চলে এসেছিলেন শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত করার আন্দোলনে ঝাঁপ দেবেন বলে। প্রথমে বরোদায় গায়কোয়াড় রাজ্যের অন্যতম প্রশাসক পদে কিছুদিনের জন্য চাকরি করলেও ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতার আহ্বানেই ফেরেন কলকাতায়। তখন স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসান হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আত্মোন্নতির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল যোগীপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের। কলকাতায় যখন পা রাখলেন, তখন যদিও কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে স্বদেশী ও সশস্ত্র আন্দোলনের মুখবন্ধ রচনা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু গোটাটাই ছিল বেশ অগোছালো। অনুশীলন সমিতি, গুপ্ত সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি সবই ভুগছিল দ্বন্দ্ব ও দলাদলির কণ্টক যন্ত্রণায়। অরবিন্দ নিজেই লিখেছেন : 'When I went to Bengal' three or four years before the swadeshi movement was born and what I found was apathy and despair.'

শ্রীঅরবিন্দের প্রচেষ্টাতেই জড়তা ও ক্লীবতা ত্যাগ করে একটি সুসংহত সশস্ত্র সংগ্রামের পটভূমি রচিত হয়েছিল। তিনিই প্রথম কংগ্রেসি রাজনীতিসর্বস্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের বদলে ডাক দেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের। তাঁর দাবি ছিল 'Absolute autonomy free from foreign control' এবং 'Complete political independence'। মাত্র বছর আটেক ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামী ভূমিকা। কিন্তু আগাগোড়া ইউরোপীয় আবহাওয়ায় মানুষ ধনবান চিকিৎসক কৃষ্ণধন ঘোষ এবং ভারতীয় জাতীয়তার পিতামহ রাজশেখর বসুর কন্যা স্বর্ণলতাদেবীর সন্তান অরবিন্দ ওরফে অরবিন্দ অ্যাক্রয়েড ঘোষের এই ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা যেভাবে

তাঁকে সম্পূর্ণ সনাতনী মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তিনিই বলেছিলেন, 'I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith. I say it is the Sanatana Dharma which for us is nationalism।

জাতীয়তার নতুন ব্যাখ্যাতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন তিনি। বললেন, সনাতন ধর্মই হলো জাতীয়তা। মনে হলো, যেন আরও এক স্বামীজী হাজির চেহারার বদল ঘটিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী জীবনের অন্যতম ঘটনা আলিপুর বোমা মামলা। মানিকতলার ৩২ নম্বর মুরারীপুকুর রোডের বাগানবাড়িটি ছিল অরবিন্দের বাবা কৃষ্ণধন ঘোষের। সেটি ছিল বঙ্গের বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম ঘাঁটি যেটির দায়িত্বে ছিলেন অরবিন্দের ছোটো ভাই বিপ্লবী বারীন ঘোষ, যিনি নিজেও জন্মেছিলেন ইংল্যান্ডের মাটিতে। এই বাড়ি থেকেই প্রচুর পরিমাণ বোমার মশলা, বারুদ, পিস্তল তৈরি করা হতো। ততদিনে যুগান্তর গোষ্ঠী সশস্ত্র সংগ্রামে পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছে। মুরারীরপুকুর রোডের বাগানবাড়ি থেকেই সরবরাহ করা দাহ্য পদার্থ, পিস্তল ও ডিনামাইট মজফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যার কাজে লেগেছিল বলে পুলিশের অভিযোগ ছিল। এই হত্যার প্রচেষ্টায় ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট সকাল ছ'টায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেন নাবালক বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ব্রেট এবং রিভস-এর বেঞ্চ। এরপর একের পর এক বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই, বাঙ্গালি বিরোধী পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস, ব্রিটিশের দালাল পুলিশ সুপার সামসুল আলমের হত্যার পর ব্যাপক ধড়পাকড় শুরু হয়ে যায়।

চন্দননগরে ছ' সপ্তাহ কাটিয়ে কলকাতায় পা দিলে ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ১৯০৮ সালের ২৯ এপ্রিল গ্রেপ্তার করা হয় অরবিন্দকে। অভিযোগ, সেই বোমা তৈরি ও দাহ্য বিস্ফোরক বাগানবাড়িতে রাখা। পুলিশ ৩৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। কারও ফাঁসি, কারও দ্বীপান্তর, কারও-বা যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি হয়েছিল। কিন্তু অলৌকিভাবে শ্রীঅরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অসামান্য ব্যারিস্টারি তার্কিক যুদ্ধে অরবিন্দকে নির্দোষ বলে মেনে নিতে বাধ্য হলেন বিচারপতি বিচক্রফট! তিনি মান্যতা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন অরবিন্দের একটি মাত্র স্বীকারোক্তিকে। অরবিন্দ আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— 'মহামান্য আদালত! আমি দেশের স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেছি। এটি যদি আইনবিরুদ্ধ হয়, তাহলে আমি স্বীকার করছি আমি দোষী।' মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কেমব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী এবং ১৮৯০-এর ব্যাচের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সঙ্গী বিচারপতি বিচক্রফট। মোট ১৭ জন পুরোপুরি মুক্তি পেয়েছিলেন। শাস্তি হয় ১৯ জনের। এঁদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দের ভাই বারীন ঘোষ যিনি শুধুমাত্র ইংল্যান্ডে জন্মেছিলেন বলে তাঁকে ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তরের শাস্তিতে আন্দামান জেলে পাঠানো হয়েছিল। অরবিন্দের মুক্তির পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাঁর সঙ্গে অরবিন্দের এক অলৌকিক আত্মিক সম্বন্ধ ছিল, লিখেছিলেন— 'সেই রুদ্র দূতে বলো, কোন রাজা কবে পারে শাস্তি দিতে?'

অরবিন্দের জীবনের তৃতীয় পর্বটি ছিল অজ্ঞাতবাস এবং নিঃসন্দেহে এই পর্বটিই সবচেয়ে রোমাঞ্চকর।

আলিপুর বোমা মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম অজ্ঞাতবাসে যান চন্দননগর। তারিখটা ছিল ১৯১০ সালের ১৫ জানুয়ারি। গহীন রাতে উত্তর কলকাতার এ গলি-সে গলি হয়ে রামচন্দ্র মজুমদারের দেখানো পথে অরবিন্দ বাগবাজার ঘাট থেকে নৌকোয় উঠে পরদিন ভোরে চন্দননগর পৌঁছান। সেখান থেকে ফরাসি সরকারের এবং চন্দননগরের গুপ্ত সমিতির সদস্যদের সাহায্যে অরবিন্দ পণ্ডিচেরী রওনা হন ডুপ্লেক্স নামক জাহাজে। তারিখ ১ এপ্রিল। ৩ এপ্রিল তিনি পৌঁছে যান পণ্ডিচেরী। তখনও ব্রিটিশ পুলিশ জানে না, অরবিন্দ বঙ্গে ছেড়ে চলে

গেছেন চিরকালের জন্য। কিন্তু কেন? এর উত্তর আমরা অরবিন্দের মুখেই শুনে নিই :

'I may also say that I did not leave politics because I felt I could do nothing more there; such an idea was very far from me. I came away because did not want anything to interfere with my yoga and because I got a very distinct adesh (order) in the matter. I have cut connection entirely with politics, but before I did so I knew from within that the work I had begun that was destined to be carried forward, on lines I had foreseen, by others and that the ultimate triumph of the movement I had initiated was sure without my personal action or presence. There was not the least motive of despair or sense of futility behind my withdrawal.

অনেকে বলেন, ব্রিটিশ সরকার তাঁর ওপর ভারতে বসবাসের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। না, এমন কোনো প্রমাণ ব্রিটিশ নথিতে কখনো পাওয়া যায়নি। অরবিন্দ নিজেই লিখেছিলেন, 'In the first place, I am not prepared to return to British India. This is quite apart from any political obstacle.

আর বলেছিলেন--- I came to Pondicherry in order to have freedom and tranqulitity for a fixed object having nothing to do with present politics--- in which I have taken no direct part since my coming here.

স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে উত্তর কলকাতার বাড়িতে যেমন তিনি মাদুর পেতে শুতেন, পরনে থাকত কটিবস্ত্র। পকেট ছিল না, থাকলেও তা থাকত কপর্দকশূন্য। তাঁকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করতে তাঁর বোন সরোজিনীর 'ক্রাউড ফান্ডিং'-এর মাধ্যমে কিছু টাকা পয়সা জোগাড়ের যে ইতিহাস, পণ্ডিচেরিতে পা রাখার পরও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সেখানে উঠেছিলেন রু মুণ্ডুমারি আম্মান কোইলে-র একটি বাড়িতে যেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিজয়কুমার নাগ এবং সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর প্রতিদিনের খাদ্যবস্তু ছিল— ১. ভাত, ২. মুগের ডাল, ৩. বেগুন, ৪. বিলিতি কুমড়ো, ৫. দুধ। এর কোনো পরিবর্তন হতো না। এমনকী সহজলভ্য আলুও জুটত না। সুরেশ চন্দ্র লিখেছেন--- 'নিয়তির অমোঘ দুর্নিবার বিধানের মতো ওই বস্তুগুলির রোজ আবির্ভাব ঘটত আমাদের সেই তেতলার রান্নাঘরে বিকারহীন বিবেকহীন বিতৃষ্ণাহীন নিয়মানুবর্তিতায়।' বাড়ির তিনতলায় ছিল শোয়ার ব্যবস্থা— মেঝেয় পাতা একফালি মাদুর। অতি সাধারণ জীবনযাপন এবং অতি উচ্চস্তরের ভাবনাময় জীবনের অনেকটা সময় কাটত যোগ সাধনায় ও পড়াশোনায়। কারও চাপে নয়, কোনো বাধ্যবাধকতায় নয়— বলেছেন, 'I had purposefully retired here in order to pursue my yogic sadhana'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন মনের আরাম, প্রাণের শান্তি খুঁজতে পৌঁছেছিলেন বোলপুরে, আশ্রম গড়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। ঠিক তেমনই পুরোপুরি ঈশ্বর সন্ধানে না হলেও মনুষ্যত্বের মঙ্গল কামনায়, ভারতবর্ষের উন্নতির কামনায় অরবিন্দ ধীরে ধীরে ডেড সিটি পণ্ডিচেরীতে গড়ে তুললেন সেই প্রাণের শান্তি, মনের আরামের আবাসস্থল— অসহায় মানুষের নির্ভরতার জায়গা।

যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার এখানেও উত্যক্ত করতে ছাড়েনি। ফরাসি জাহাজে পণ্ডিচেরী পৌঁছলেও ব্রিটিশ পুলিশের মনে হয়েছিল, অরবিন্দ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে ফ্রান্সেই। কিন্তু জানাজানি হয়ে যাবার পরও ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরীতেও অরবিন্দের স্বাধীনতা সংগ্রামী অস্তিত্বের ভূত দেখতো ব্রিটিশ পুলিশ। নলিনীকান্ত গুপ্তের লেখায় জানা যায়— 'ভারতের ব্রিটিশরাজ কখনো বিশ্বাস করেনি যে, শ্রীঅরবিন্দ ফরাসি রাজ্যে এসেছেন যোগ সাধনার জন্য— ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এসব হলো ছলাকলা— তারা শ্রীঅরবিন্দকে জানে, সমস্ত ভারতে একমাত্র এই ব্যক্তিটিই most dangerous, সকল অনিষ্টের মূল।'

ব্রিটিশপুলিশ অনেকভাবে চেষ্টা করেছিল মিথ্যা নথি তৈরি করে শ্রীঅরবিন্দকে ফাঁসানোর, তাঁকে অপহরণ করার। শেষ পর্যন্ত যৌগিক শক্তির ছটায় কিংবা ঈশ্বরের অসীম মহিমায় শ্রীঅরবিন্দকে ছুঁতেও পারেনি ব্রিটিশ পুলিশ। আর শ্রীঅরবিন্দ ১০ নভেম্বর ১৯১০ তারিখের The Hindu পত্রিকায় তাঁর তৎকালীন অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন— 'I left British India over a month before proceedings were taken against me and as I had purposely retired here in order to pursue my yogic sadhana undisturbed by political action or pursuit and had already severed connction with my political work. ...I with to state emphatically that I have not been in British India since March last and shall not set foot on British territory even for a single moment in the future untill can return publicly.

শ্রীঅরবিন্দ আর ফেরেননি। আর সেদিনের সেই শ্মশানভূমি যেখানে উন্মুক্তজীবন, যুব আন্দোলন, সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুশীলন— জাগ্রত প্রাণের চিহ্ন কিছু ছিল না, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ আর গুন্ডার দলের দাপাদাপিই ছিল প্রাণস্পন্দন--- সেই পণ্ডিচেরী একদিন ফরাসি কন্যা শ্রীমা আর ঋষি অরবিন্দের সনাতন ধর্মচিন্তায় পরিণত হলো সত্যিই এক মহাধ্যানস্থানে। এখানে অরবিন্দ হয়ে উঠেছেন পুর্ণ ঋষি, জাতীয়তার নবমন্ত্রে ক্রমশ উত্তরণ ঘটেছে বিশ্বকল্যাণের অভিমুখে। তাঁরই মাহাত্ম্যে একদা 'মৃত শহর' পণ্ডিচেরী এখন তপস্যাভূমি।

সহায়ক পাঠ : *সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, স্মৃতিকথা, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী নলিনীকান্ত গুপ্ত স্মৃতির পাতা। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা। Sri Aurobindo, On themself, Sri Aurobindo Arlirans, Pondicheriy.*

গৌতম নিয়োগী শ্রীঅরবিন্দ সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন।

বিপ্লবীদের বলিদান ভুলে যাওয়া জাতির পক্ষে একটি অপরাধ

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙ্গালি ইতিহাসবিস্মৃত জাতি। যে জাতি তার ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, পদে পদে তার পতন ও অবক্ষয় অনিবার্য। ইতিহাস-সচেতনতার অভাবের দরুন বাঙ্গালি জাতিকে গত ৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কঠিন মূল্য দিতে হচ্ছে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের আগ্নেয় প্রতিরোধ ভুলে গিয়েছে বাঙ্গালি। ১৯৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে জীবিত বরেণ্য বিপ্লবীরা সমাজে পাননি কোনো সম্মান, পাননি কোনো অর্থসাহায্য। অধিকাংশই ছিলেন আশ্রয়হীন, সহায়-সম্বলহীন। স্বাধীন দেশের স্বপ্ন বুকে নিয়ে যাঁরা বীরগতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদের স্বপ্নের শোষণমুক্ত, অখণ্ড ভারত আজও অধরা। এক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক, ছাগলাদ্য জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে জেহাদি শক্তির গোপন গাঁটছড়ায় দেশ হয়েছিল দ্বিধাবিভক্ত, হিন্দুরক্তরঞ্জিত! ঘটানো হয়েছিল ভারত জননীর অঙ্গচ্ছেদ। লড়াইয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে যা হয়েছিল, তা — 'ভারত বিভাজন ও ক্ষমতা হস্তান্তর'।

'ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়'

ডিসেম্বর মাসটি জুড়ে রয়েছে বহু বরেণ্য বিপ্লবীর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন। ৩ ডিসেম্বর দিনটি বঙ্গজননীর দামাল সন্তান ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন। ৫ ডিসেম্বর দিনটি ঋষি অরবিন্দের প্রয়াণ দিবস। ৬ ডিসেম্বর হলো বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র গুপ্তর জন্মদিন। ৮ ডিসেম্বরে বিপ্লবী বাদল গুপ্তর মৃত্যুদিন। ১০ ডিসেম্বর হলো বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্মদিবস। ১৩ ডিসেম্বর দিনটি বিপ্লবী বিনয়কৃষ্ণ বসুর প্রয়াণ দিবস। ৩০ ডিসেম্বর দিনটিও ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ১৯৪৩ সালের এই দিনটিতে ব্রিটিশ দখলমুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতভূমির অন্তর্গত স্বাধীন এই ভূখণ্ডের তিনি নামকরণ করেন— শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ।

অগ্নিযুগের প্রথম বীরগতিপ্রাপ্ত বাঙ্গালি বিপ্লবী হলেন প্রফুল্ল চাকী। তারপর স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণীকে সম্বল করে ব্রিটিশ বিরোধী আপোশহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মহান বিপ্লবীরা। ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, আত্মোন্নতি সমিতি, শ্রীসঙ্ঘ, মুক্তি সঙ্ঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের আগ্নেয় প্রতিরোধ বঙ্গের আকাশে ছিল যেন এক দুর্নিবার কালবৈশাখী ঝড়! দেশ স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গভূমির বিভিন্ন প্রান্তে বীর-বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে যেসকল স্মৃতিফলক স্থাপিত হয়েছিল, গত ৭৫ বছরে ক্রমে ক্রমে সেগুলি হারিয়ে গিয়েছে। কলকাতার মুরারীপুকুরে বিপ্লবীদের বাগানবাড়ির জায়গাটি 'বোমার মাঠ' নামে পরিচিত। জায়গাটি আজ জঞ্জালে পূর্ণ, পূতিগন্ধময়। বিপ্লবীদের স্মৃতিফলকটি খুঁজে পাওয়াই সেখানে দুষ্কর। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর লেনে যে বাড়িটি একদা ছিল শ্রীঅরবিন্দের বাসভবন, যেখানে তিনি 'ধর্ম্ম' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন, সেই বাড়িটি হেরিটেজ ঘোষণা করেনি রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুরসভা। সিন্ডিকেট ও প্রমোটার-রাজের কবলে পড়ে পুরনো বাড়িটি। তাকে ভেঙে ফেলে বর্তমানে সেখানে মাথাচাড়া দিচ্ছে একটি বহুতল। কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে অনাদরে, অবহেলায় পড়ে রয়েছে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর মূর্তি। স্থানটি আবর্জনাময় তো বটেই, সন্ধ্যে গড়ালে সেখানে বসে নানা অসাধু ও মাতালদের আড্ডা।

'যাঁরা স্বর্গগত তাঁরা এখনও জানে
স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি!'

স্বদেশজননীর শৃঙ্খলমোচনে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিনিময়ে কোনো কিছু প্রত্যাশা করেননি দেশবরেণ্য বিপ্লবীরা। কিন্তু স্বাধীনতার পর বাঙ্গালি সমাজের দায়িত্ব ছিল তাঁদের শ্রদ্ধা-সম্মান জানানোর। তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে এই রাজ্য। বামপন্থায় জারিত এক শ্রেণীর ইতিহাসবিদদের কার্যকলাপের দরুন বিকৃত ইতিহাসের চর্চা চলেছে স্কুল-কলেজগুলিতে। ১৯৪৭-পরবর্তী অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার ছিল যাদের হাতে, তাদের অনেকেই বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'সন্ত্রাসবাদী' পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছে। তাদের মুখপত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কার্টুন এঁকেছে। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তাঁকে 'নেতাজী' বলে সম্বোধন করেছে। কমিউনিস্টরা তাঁকে 'কুইসলিং' আখ্যা দিয়েছে। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচনা তাই আজ সময়ের দাবি। উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে বিপ্লবীদের জন্মদিবস- প্রয়াণদিবস উদ্‌যাপন, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে তাঁদের এবং বিপ্লবী সংগঠনগুলির অবদান স্মরণ, দেশের ইতিহাস পুনর্লিখনের মাধ্যমে আধুনিক প্রজন্মের সামনে স্থাপন করতে হবে আত্মত্যাগ-বলিদান- সততা-সমর্পণের দৃষ্টান্ত। তবে বন্ধ হবে বিপ্লবীদের অসম্মান করার ভয়াবহ প্রবণতা। তবে খণ্ডাবে ৭৫ বছরের অপরাধ ও গ্লানি। আবির্ভূত হবে এক নতুন ভারত, যার আদর্শ হলো--- 'রাষ্ট্রহিত সর্বোপরি'। □

উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে বিপ্লবীদের জন্মদিবস-প্রয়াণদিবস উদ্‌যাপন, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে তাঁদের এবং বিপ্লবী সংগঠনগুলির অবদান স্মরণ, দেশের ইতিহাস পুনর্লিখনের মাধ্যমে আধুনিক প্রজন্মের সামনে স্থাপন করতে হবে আত্মত্যাগ-বলিদান-সততা-সমর্পণের দৃষ্টান্ত। তবে বন্ধ হবে বিপ্লবীদের অসম্মান করার ভয়াবহ প্রবণতা।

ফঃ ৩

ডিসেম্বরে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ডাকটিকিট

সৈকত চট্টোপাধ্যায়

ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে ডিসেম্বর মাস গুরুত্বপূর্ণ। বহু বিপ্লবীর আবির্ভাব-তিরোধান এবং বিখ্যাত অলিন্দ যুদ্ধ ডিসেম্বর মাসের বিভিন্ন তারিখকে ভারতবাসীর কাছে স্মরণীয় করে রেখেছে। ভারতীয় ডাকবিভাগ এই বিপ্লবীদের স্মরণে বিভিন্ন

সময়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

ইংল্যান্ডে অরবিন্দ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অধ্যয়ন করে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একাধিক নিবন্ধ রচনা করেন। আলিপুর বোমা মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হন। এই সময় তাঁর বিরুদ্ধে আলিপুর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়, যদিও প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান। তাঁর ভাই যুগান্তর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রথমে প্রাণদণ্ড, পরবর্তীতে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত হন। শ্রীঅরবিন্দ জেলে থাকাকালীন আধ্যাত্মিক চেতনায় ঋদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর তিনি পণ্ডিচেরী চলে যান এবং রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৬ সালে নিজের আধ্যাত্মিক সহকারী মীরা আলফাসার (শ্রীমা) সঙ্গে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত সরকার ১৯৭২ সালে শ্রীঅরবিন্দের ১০০তম জন্মজয়ন্তী এবং ২০২২ সালে ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

১৯৯০ সালে ক্ষুদিরাম বসু এবং ২০১০ সালে প্রফুল্ল চাকীর নামে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের মেডিক্যালের ছাত্র বিপ্লবী বিনয়কৃষ্ণ বসু ১৯৩০ সালে বঙ্গ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে গুলি করে হত্যা করেন। গ্রেপ্তারি এড়াবার জন্য ছদ্মবেশে তিনি কলকাতায় আসেন। কলকাতায় যুগান্তর দলের দুই বিপ্লবী বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে মিলিত হন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর যুগান্তর দলের সদস্য বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত ছদ্মবেশে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিঙে প্রবেশ করেন। তাঁরা দোতলায় উঠে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করেন এবং একটি ছোট্ট ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে পূর্বদিকের বারান্দায় ছুটে যান। ইতিমধ্যে লালবাজারের পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে তাঁদের ঘিরে ফেলেন। রাইটার্স বিল্ডিঙের অলিন্দে তিন তরুণের সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিশবাহিনীর গুলির লড়াই শুরু হয়, যা ইতিহাসে 'অলিন্দ যুদ্ধ' নামে খ্যাত। শেষপর্যন্ত তিনজনের সমস্ত গুলি শেষ হয়ে তিনজনই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বাদল গুপ্তের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়, কয়েকদিন পর হাসপাতালে বিনয় বসু মারা যান এবং দীনেশ গুপ্ত আরোগ্য লাভ করার পর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের বাবা সতীশচন্দ্র গুপ্ত পরাধীন ভারতবর্ষের ডাকবিভাগের কর্মচারী ছিলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম বিপ্লবী অনন্ত সিংহের জন্মদিন ১ ডিসেম্বর, ১৯০৩।

অগ্নিকন্যা বীণা দাস ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৬ ঋষিকেশে পরলোকগমন করেন। ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে তাঁর ৯ বছরের কারাদণ্ড হয়।

নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী। তিনি পূর্ণচন্দ্র দাসের সহকর্মী এবং পূর্ণচন্দ্র পরিচালিত গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন মাদারিপুর সমিতির সদস্য। তিনি বিপ্লবী বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়ি বালামের তীরে খণ্ডযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৩ ডিসেম্বরে ১৯১৫ বালেশ্বরে তিনি বীরগতিপ্রাপ্ত হন।

বুড়িবালাম খ্যাত বিপ্লবী বাঘা যতীনের মৃত্যুবার্ষিকী, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মহাবিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রতিকৃতি সংবলিত ডাকটিকিট প্রকাশিত হলেও বীণা দাস, নীরেন্দ্রনাথ বা অনন্ত সিংহের ছবি সংবলিত ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়নি। □

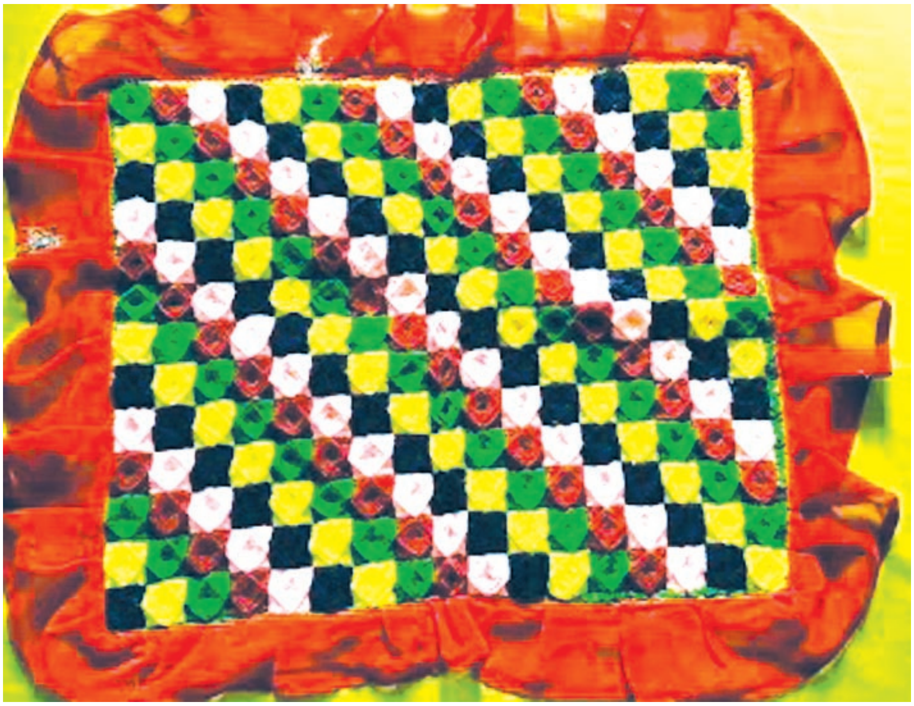

লুপ্তপ্রায় ঘরোয়া শিল্প—চটের আসন

সুতপা বসাক ভড়

বাঙালি মহিলারা সৃষ্টিশীলতা ও কল্যাণময়ী হাতের ছোঁয়ায় তাঁদের সংসারকে সুখে, শান্তিতে পরিবর্তনের সঙ্গে সেই প্রচেষ্টার রূপভেদ হলেও মূল উদ্দেশ্য এখনও সেইরকমই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত আত্মীয়স্বজন এলে তাদের আসন পেতে বসতে দেওয়ার প্রচলন ছিল। এছাড়াও পূজা-আর্চা, অন্নপ্রাশন, বিবাহাদি, অতিথি-আপ্যায়ন রক্ষার জন্য আসন ছিল অপরিহার্য। বর্তমানেও আমরা পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে আসন ছাড়া ভাবতে পারি না। আর তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাজার থেকে কিনে আনা হয়ে থাকে; অথচ আগে এরকম ছিল না। এখন প্রশ্ন হলো, তখন আসন আসত কোথা থেকে?

বাড়ির মহিলারা ছিলেন সেইসকল আসনের সৃষ্টিকর্ত্রী। অনেক কম খরচে করে তাঁরা এক-একটি অতি উচ্চমানের নিত্য ব্যবহার্য শিল্পকর্ম প্রস্তুত করতেন সংসারের জন্য। শীতকালে দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্ম সেরে দুপুরের রোদে বসে তাঁরা রূপ দিতেন এইসকল শিল্পকর্মের। অভিজ্ঞ বয়স্কারা ছিলেন নতুনদের পথপ্রদর্শিকার ভূমিকায়। এভাবে ধারাবহিকভাবে নতুন প্রজন্মের মহিলারাও হয়ে উঠতেন সুনিপুণা। মেলবন্ধন হতো পুরাতন ও নবীনের। সৃষ্টি হতো একের পর এক উৎকৃষ্টমানের আসন। একটি আসন তৈরির জন্য অতি সামান্য মূল্যের কিছু উপকরণের প্রয়োজন। সেগুলি হলো :

১. একটি দুই থেকে আড়াইফুট লম্বা এবং দেড় থেকে ছ'ফুট চওড়া চটের টুকরো। এক্ষেত্রে আমাদের একটু সচেতন হতে হবে যে পাতলা চট হলে আসন ভালো হবে না, আবার খুব ঠাসা বুনন চটেও বানাতে অসুবিধা হয়। মাঝারি চটের টুকরো নিতে হবে, যার ছিদ্রগুলি দিয়ে সহজেই সুচ পার হতে পারে। ২. এরপর প্রয়োজনমতো রঙিন ১০০-১৫০ গ্রাম উল। ৩. সেলাই করার জন্য মোটা ও পাতলা সুচ। ৪. এক মিটার লাল রঙের কাপড় ও ৫. লাল রঙের সুতো।

প্রথমে চটের টুকরোটি ভালোভাবে ঝেড়ে নিতে হবে। এরপর যে কোনো রঙের উল (পুরানো হলেও চলবে) দিয়ে চটের চারধারে অনেকটা ইন্টারলকের মতো ফাঁকা ফাঁকা করতে হবে এতে চটের সুতোগুলো বেরিয়ে যাবে না। এরপর চারধারে আন্দাজমতো এক ইঞ্চি ছেড়ে সীমানা বানিয়ে নেব। চটের লম্বালম্বিভাবে দুটি ছিদ্র এবং আড়াআড়িভাবে দুটি ছিদ্র নিয়ে একটি ক্রুশস্টিচের ঘর বানাতে হবে। সম্পূর্ণ আসনে এই হবে ঘরের পরিমাপ। যাঁরা আসন বানানোতে নবীন, তাঁদের জন্য কিছু জ্যামিতিক নকশা সহজতম হতে পারে। যেমন সীমানার ঘর হিসেবে করে নির্দিষ্ট সংখ্যায় বিভিন্ন রঙের চৌকো, আয়তাকার, বরফির ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে নকশা সেলাই করতে পারেন। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার নকশার বই পাওয়া যায়, সেগুলির সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। ফুল, পাতা বা অন্যান্য নকশা ফুটিয়ে তুলতে হলে প্রথমে চটের ওপর নকশা তুলতে হবে। তারপর খালি অংশ অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের উল দিয়ে ক্রসস্টিচ দিয়ে ভরে দিতে হবে। আসন বোনা সম্পূর্ণ হলে কাপড় আসনের আকারের থেকে কমপক্ষে চার ইঞ্চি লম্বা চওড়ায় বড়ো করে কেটে ফেলতে হবে। আসনের পেছন দিকে শালু সেলাই করে বসাতে হবে। প্রান্তগুলি আসনের সীমানা ধরে সেলাই করে নিতে হবে সরু সুচের সাহায্যে।

শালুটি সেলাইয়ের আগে আসনের মাঝখানের আন্দাজমতো একটু কাপড় ভেতর দিকে মুড়ে সেলাই করে নিতে হবে। ধোয়ার পরে শালু ছোটো হয়ে যায়, তখন ওই মাঝের সেলাইটি খুলে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এরপর ধার বরাবর কুঁচি বানিয়ে সেলাই করে নিলেই তৈরি আমাদের পারম্পরিক আসন। প্রতিদিন আধ ঘণ্টা সময় দিলে একমাসের মধ্যে আমরা একটি আসন তৈরি করতে পারি।

আগে উল ব্যবহার হতো না, ভালো তাঁতের শাড়ির পাড়ের নকশার সুতো বের করেও অনেকে সুন্দর সুন্দর আসন বানিয়েছেন। তারপর এল লাচ্ছি সুতো। সেখান থেকে চার বা ছয়গাছি সুতো বের করে, তাই দিয়ে নকশা তোলা হতো। ক্রুচেটের সুতো ব্যবহার করতেন অনেকে। তবে উল সহজলভ্য, রং ওঠে না, উজ্জ্বল রঙের হয়, সেজন্য বর্তমানে এগুলিই বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। এইভাবে আসন বানিয়ে আমরা ব্যবহার তো করতেই পারি, তাছাড়া ঘর সাজানোতে যেমন সোফা, ডিভানের ওপর পাততে পারি। এইভাবে একটি পারম্পরিক, নান্দনিক শিল্পকর্ম আমাদের উৎসাহে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। একটু চেষ্টা করলেই আমরা মহিলারা একটি ঘরোয়া শিল্পকর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারি, যা একান্ত ভাবে আমাদের দেশীয়। □

ইউরিক অ্যাসিড থেকে মুক্তির উপায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

খাদ্যদ্রব্যেরে মাধ্যমে প্রতিদিনই কিছু ইউরিক অ্যাসিড আমাদের শরীরে যায়। মূলত প্রোটিন জাতীয় খাবারে ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকে। শরীরে এই অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলেই শুরু হয় নানা বিপত্তি। অর্থাৎ শরীরের মেটাবলিক ডিজঅর্ডারের জন্য ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ে-কমে। যদি কেউ প্রোটিনের অভাবে রোগা হয়ে যাচ্ছে বা দুর্বল হয়ে পড়ছে ভেবে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া শুরু করে তাহলে বিপদ। মনে রাখতে হবে, অতিরিক্ত প্রোটিন মানেই অতিরিক্ত ক্ষতি। কারণ ইউরিক অ্যাসিড প্রোটিনযুক্ত খাবার থেকেই আসে। গেঁটে বাত বা গাউট পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো রোগ অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডের জন্য হয়। শরীরে প্রয়োজনের বেশি ইউরিক অ্যাসিড হয়ে গেলে তা শরীরের বিভিন্ন সন্ধিস্থলে জমা হতে থাকে। ধীরে ধীরে তা একটি ক্রিস্টালের আকার ধারণ করে। তখন বিভিন্ন সন্ধিস্থলে যেমন হাঁটু, হাতের কনুই, পায়ের বুড়ো আঙুল ইত্যাদি জায়গা ফুলে যায়। এছাড়া, কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। যাদের ডায়াবেটিস বা কিডনির অন্যান্য অসুখ থাকে, তাদের ক্ষেত্রেই ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি থাকে।

রোগীর পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাবা-মা কারও থাকলে, পরবর্তী প্রজন্মে গাউট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । কোনো কোনো ক্ষেত্রে জন্ম থেকেই কারও শরীরে মেটালিক পদ্ধতিতে কিছু ত্রুটি থেকে যায়, সেক্ষেত্রে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধির চিকিৎসা করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তবে মনে রাখা উচিত, ইউরিক অ্যাসিডের অভাবজনিত কারণে কোনো অসুখ হয় না। বরং এই অ্যাসিডের অতিরিক্ততার জন্যই নানা

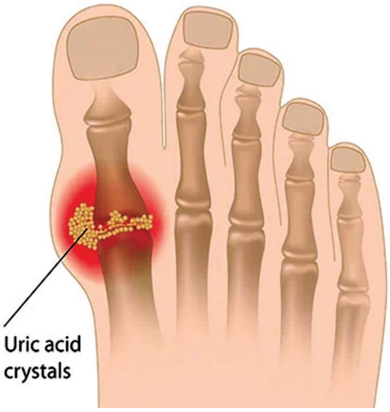

অসুখ সৃষ্টি হয়। সাধারণত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাদের গাউটের সমস্যা বেশি হয়। তাঁরা নিয়মিত সাধারণ খাবার খাওয়ার অভ্যাস এবং কায়িক পরিশ্রম অন্তত কিছুটা কম করেন। পুরুষের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ সিসি রক্তে ৭ মিলি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬ মিলি ইউরিক অ্যাসিড স্বাভাবিক। এই মাত্রার বৃদ্ধি হলেই সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড জমাট বেঁধে মোনোসোডিয়াম ফিউরেট নামে ক্রিস্টালের আকার ধারণ করে দেহের সন্ধিস্থলে জমা হয়।

এছাড়া ডায়াবেটিস, লিউকোরিয়া, হাইপার টেনশনের রোগীদের বিশেষ সাবধানে থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রোটিন জাতীয় খাবার বন্ধ করতে হয়। প্রোটিনযুক্ত সব খাবারেই ইউরিক অ্যাসিড থাকে। যেমন পাঁঠার মাংস, মুসুর ডাল, বাদাম, বিউলির ডাল, গাজর, বেগুন, শালগম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বড়ো মাছ, ডিম, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি। অনেক ছোটো ছেলে-মেয়ে ডিম খেতে ভালোবাসে। অনেকে হয়তো দিনে দু-তিনটে খেয়ে নেয়। সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ভাবার কারণ নেই যে, প্রোটিন বেশি আছে বলেই ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধিজনিত অসুখ করবে। আসলে এই ছেলে-মেয়েদের দেহের পাচন প্রক্রিয়াই এমন থাকে যে অতিরিক্ত কিছু তৈরি হয় না। পুরো প্রক্রিয়াই স্বাভাবিক। তবে ৫০ বছর বয়স পেরনোর পর প্রোটিন জাতীয় খাবার কম খাওয়াই ভালো। তখন দুধ, ছোটো মাছ, হালকা খাবারই শরীরের জন্য বেশি ভালো। মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজের পর বাত এবং মোটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাঁদের প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। গর্ভবতী মেয়েদের রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তখন প্রোটিনযুক্ত খাবার বন্ধ করতে হবে।

বয়সের পার্থক্যে ইউরিক অ্যাসিডের তারতম্য হতেই পারে। কোনো ছেলে বা মেয়ের জন্মের পর শারীরিক গঠন এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়া তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে। তখন শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হতে থাকে। এছাড়া প্রোটিনযুক্ত খাবারের মাধ্যমেও ইউরিক অ্যাসিড শরীরে যায়। ইউরিক অ্যাসিডের অতিরিক্ততার জন্য গাউট বা গেঁটে পাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে ওষুধের পাশে দরকার সঠিক খাদ্যাভ্যাস। মাটির নীচের সবজি খাওয়া কমিয়ে দিতে হবে তাঁর সঙ্গে মদ্যপান, ধূমপান বন্ধ থাকবে। মনে রাখতে হবে ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে শুধু ওষুধ খেলেই হবে না, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, সংযত জীবনযাপন করা দরকার প্রত্যেক মানুষেরই। কারণ, অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডের জন্য রেনাল ফেরিওর হতে পারে। কিডনি সমস্যা হতে পারে। তাই সঠিক খাবার খাওয়ার মাধ্যমেই নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসু। □

ওরা মৃত্যুমঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছে জয় মা ভারতজননী

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর। সকাল থেকেই পার্ক স্ট্রিটের একটি ঘরে সাজ সাজ রব। এক ডেকচি মাংস রান্না হয়েছে। দুই যুবক প্রতিযোগিতা করে খাচ্ছে। এ জীবনে এটাই ওদের শেষ খাওয়া। তাই কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখতে চায় না। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। দুজনেই সমান। কেউ হার মানতে রাজি নন। 'আর একটু মাংস দেব দীনেশ'— জানতে চাইলেন নিকুঞ্জবাবু। দীনেশ অবাক। 'সে কী, এখনো তো শুরুই করিনি'। 'তোমাকে দেবো বাদল'? 'আপনি দিতে থাকুন, সময় হলে আমি মানা করবো'। 'পারবিনে বাদল পারিবিনে, আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাভ নেই। হেরে ভূত হয়ে যাবি'। নিজের মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন নিকুঞ্জবাবু। স্বাধীনতার বেদিমূলে আজ ওদের চরম উৎসর্গের দিন। আর হয়তো ওরা ফিরবে না। কোনোদিন পৃথিবীর মুখ দেখবে না। কিন্তু দেখে কে বলবে সেজন্যে ওদের মনে এতটুকুও দুর্ভাবনা আছে? মৃত্যু যেন ওদের কাছে একটা খেলা মাত্র।

কতই-বা বয়স ওদের? দীনেশের কুড়ি, আর বাদল আঠারোয় পা দিয়েছে মাত্র। ভাবতেও যেন অবাক লাগে। খাওয়া শেষ। পাতে কিছুই পড়ে নেই। এরপর সাহেবি পোশাকে নিজেদের সাজবার পালা। খানিক বাদে নিকুঞ্জবাবু নিয়ে এলেন ট্যাক্সি। আর দেরি নয়। বাদল আর দীনেশকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলেন। ঘরে তখন দীনেশ তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করে চলেছে রবীন্দ্রনাথের 'একবার ফিরাও মোরে' কবিতার লাইন— 'যে শুনেছে কানে, শুনেছে শেষ সংগীতের মতো...'। নিদারুণ শূন্যতায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে নিকুঞ্জবাবুর। এক মুহূর্তের দ্বিধা। নীচু গলায় ডাকলেন— 'দীনেশ'। কে? নিমেষে বাস্তবের মাটিতে ফিরে এল দীনেশ। 'ও আপনি! ট্যাক্সি এসে গেছে বুঝি'? চলুন।

ওদিকে মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহর বাড়িতেও একই দৃশ্য। বউদি সরযূ দেবীর ভোর রাত থেকে নিঃশ্বাস ফেলার জো নেই। ঠাকুরপো কী খেতে ভালোবাসে, কোনটা তার বেশি পছন্দ সেই কাজেই ব্যস্ত। শুধু মনে হচ্ছে কিছু বুঝি বাদ পড়ে গেল। তারই মাঝে দুঃসহ বেদনায় বুকটা হাহাকার করে উঠছে। আহা, ঘুমোক না আর কিছুক্ষণ! এরপর হাজার ডাকলেও তো সে আর জাগবে না। কিন্তু না, আর দেরি করা ঠিক নয়। ৯টার মধ্যেই যে ওকে চিরদিনের মতো বিদায় দিতে হবে। 'ঠাকুরপো ঠাকুরপো'— মমতামাখা ডাকে ধড়ফড় করে উঠে পড়লেন বিনয়। ইস্ কত বেলা হয়ে গেছে। 'চা-টা খেয়ে মুখ ধুয়ে এসো ভাই'। মুখ ধুয়ে এসে বিনয় অবাক! 'এত মিষ্টি কেউ কখনো খেতে পারে'? 'লক্ষ্মী ভাইটি খেয়ে নাও'। 'তোমার হাতে যখন পড়েছি তখন আর উপায় কী'— ধীরে ধীরে খেতে শুরু করে বিনয়। 'কিন্তু আর যে বেশি দেরি করা যাবে না বউদি। ন'টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে'। 'তুমি স্নান করে এসো, আমার রান্না রেডি'। খাবার আসনে বসে বিনয় অবাক। কী

> **ইসলামি বাংলাদেশে আজ বিনয়-বাদল-দীনেশ ব্রাত্য, পরিত্যাজ্য। কিন্তু আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে? এখানকার বাঙ্গালিও কি মনে রেখেছে তাদের মুক্তিদাতা বিনয়-বাদল-দীনেশকে? তারাও কি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে ৮ ডিসেম্বরের অলিন্দ যুদ্ধের সেই স্মৃতি?**

করেছে বউদি? এই যে রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার। নানা রকম মাছ, মাংস, তরকারি, পোলাও, দই, মিষ্টি কিছুই বাদ নেই। 'এত কিছু'? বউদির দু'চোখে জল, 'খাও ভাই, মন ভরে খাও। নইলে এ দুঃখ আমার সারা জীবনেও যাবে না। আমি যে তোমার জন্য নিজে হাতে এসব করেছি'। বিনয় হাসতে হাসতে বলে, 'এত খাবার কখনো মানুষ খেতে পারে? তাছাড়া ভারী শরীরে লড়াই করব কী করে? কবজির জোর দেখাতে হবে যে? ঠিক আছে, ধীরে ধীরে খেয়ে নিচ্ছি'।

খাওয়া শেষ। এবার পোশাক পরার পালা। সাধারণ পোশাক নয়, রীতিমতো রাজবেশ। দামি স্যুট, দামি টাই, দামি জুতো, সবই চোখ ঝলসানো ব্যাপার। মাথায় সাহেবি হ্যাট। সব পরার পর, এ বাদল না লালমুখো সাহেব, ঠাহর করাই মুশকিল! বউদি তো দেখে অবাক। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। বিচ্ছেদের বেদনায় ছোট্ট শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন বউদি। নিমিষে নিজেকে দৃঢ় করে তোলেন বিনয়। 'একি বউদি, যে দেশের মায়েরা যুদ্ধে যাওয়ার আগে সন্তানকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন, সে দেশের মেয়ে হয়ে তোমার চোখে জল'? ঠিক কথা। রাজেনবাবু স্ত্রীকে বলেন, 'ছেলে পরাধীন দেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছে, এ সময় মায়ের মতো তুমি নিজের হাতে বিনয়কে সাজিয়ে দাও, হাসিমুখে বিদায় দাও তাকে। এত বড়ো সৌভাগ্য জীবনে আর কি কোনোদিন পাবে?' ধীরে ধীরে নিজেকে দৃঢ় করলেন সরযূ দেবী। তাইতো, নিজের মায়ের পেটের ভাই না হলেও এমন ভাই কজনের ভাগ্যে জোটে? সে যে কতবড়ো মহৎ, বীরের মতো নিজেকে স্বাধীনতার বেদিমূলে উৎসর্গ করতে চলেছে, এ সময় চোখের জল ফেলা সত্যিই সাজে না। তাকে যে হাসিমুখে বিদায় দিতে হবে। 'তবে যাই বউদি' বিদায়ের আগে মাতৃসমা বউদির পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিল বিনয়। ছলছল চোখে মাত্র একটি কথা, 'এসো ভাই'। সত্যিতো, এর বেশি কিই-বা বলার আছে? গাড়িতে উঠে পড়ল বিনয়। পঞ্জাবি ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। অপলক দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন বউদি। তারপর একসময় সব মিলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। লগ্ন সমাগত। সামনেই দুর্ভেদ্য রাইটার্স বিল্ডিং। তখন অফিসে বসে কতগুলি জরুরি ফাইল নিয়ে ঘাটাঘাটি করছেন কারা বিভাগের কর্তা কর্নেল সিম্পসন। সামনে দাঁড়িয়ে একান্ত সচিব জ্ঞান গুহ। হঠাৎ কী একটা শব্দ শুনে সজাগ হয়ে উঠলেন সিম্পসন! কারা যেন তালে তালে পা ফেলে এদিকেই আসছে! কে, কে ওরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে? তাদের হাতে ওগুলো কী? 'ইয়োর আওয়ার ইজ কামিং, প্রে টু গড'—গর্জে উঠলেন অধিনায়ক বিনয়। বলতে না বলতেই পরপর ছ'টা গুলি বেরিয়ে এল তিনটি পিস্তল থেকে। কথা বলার সময় পেলেন না সিম্পসন। চেয়ারেই লুটিয়ে পড়লেন তিনি। এখানকার কাজ শেষ। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনজন। পরের লক্ষ্য হোম সেক্রেটারি আলবিয়ান মার। চলো ওর ঘরে। গুলির শব্দ শুনে ছুটে এলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল মিস্টার ক্রেগ, এলেন সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেল মিস্টার জেনিস। গুলিও চালালেন কয়েক গ্রাউন্ড। কিন্তু সব বৃথা। বিনয়-বাদল-দিনেশ আজ বেপরোয়া, অপ্রতিরোধ্য। গুলির বদলে গুলি, রক্তের বদলে রক্ত— এছাড়া আর অন্য কোনো ভাষা তারা জানে না, বোঝে না। বাধ্য হয়ে গা ঢাকা দিল শ্বেতাঙ্গ বীরপুঙ্গবের দল। রাইটার্স জুড়ে তখন বিভীষিকার তাণ্ডব। চারিদিকে ভীত সন্ত্রস্ত সাহেবের চিৎকার--- 'পালাও পালাও'। লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে ছুটে এলেন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। সঙ্গে ডেপুটি মিস্টার গর্ডন, মিস্টার বার্ট ও অসংখ্য পুলিশ। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। বীরপুঙ্গব লালমুখো ইংরেজ অফিসাররা কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পালাচ্ছে, কেউ টেবিলের নীচে আত্মগোপন করছে, পাদরি জনসন তো হাতির মতো বিরাট শরীরটা নিয়ে ঝুলে পড়লেন জলের পাইপ বেয়ে। আগে প্রাণ তারপর অন্য কথা। বিনয়-বাদল-দীনেশের পিস্তল থেকে তখনও অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ চলছে— দ্রাম্ দ্রাম্ দ্রাম্...। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত ডাকা হলো গোর্খা বাহিনীকে। শুরু হলো ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধ। একদিকে হাঁটু গেড়ে পজিশন নিয়েছে অগণিত গোর্খা সেনা, অন্যদিকে তিনি যুবক। একদলের হাতে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, অন্য দলের হাতে স্বল্পপাল্লার পিস্তল। একদিকে বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অসংখ্য সৈনিক, অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী তিন অসামরিক যুবক। কিন্তু হলে কী হবে কার সাধ্য তাদের সামনে দাঁড়ায়? চারিদিকে শুধু দ্রাম্ দ্রাম্ গুলির শব্দ, ধোঁয়া, আর বারুদের গন্ধ। তারই মাঝে মাঝে গর্জন উঠেছে— বন্দেমাতরম্।

হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগল দীনেশের পিঠে। তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই তার। পিঠে লেগেছে তো কী হয়েছে, হাত তো ঠিকই আছে। 'ডু অর ডাই'--- আবার দ্রাম্ দ্রাম্...চলল কিছুক্ষণ। ...তারপর একেবার চুপ। সেই একই সমস্যা। গুলি শেষ। বিনয় আর দীনেশের তবু একটা করে আছে, বাদলের পিস্তলে তাও নেই। মুহূর্তে একটা খালি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনজন। কর্তব্য শেষ। এবার মাটির পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পালা। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো বন্দে মাতরম্। নিমেষে তিনজন মুখে পুরে দিলেন পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল। বিনয় আর দীনেশ এখানেই থামলেন না। এখনো একটা করে গুলি অবশিষ্ট আছে, ফেলে রেখে কী লাভ? নিজেদের কপালে ঠেকিয়ে টান দিলেন ট্রিগারে। শেষবারের মতো রিভলবার দুটি গর্জে উঠল। তিনজনের দেহই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ভেতরে বহুক্ষণ পর্যন্ত কোনোরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে গোর্খাসেনা সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। ওদের বন্দি করতে হবে। কঠিন শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু কোথায় ওরা? বাদল ততক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঠাঁই নিয়েছে, লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। আর বিনয় ও দীনেশ? সায়ানাইডের ক্যাপসুলদুটি ঠিক সময়ে দাঁতে চেপে ভাঙতে পারেননি তারা। বিনয়ের কপালের দুটিকে গুলির ক্ষত। গুরুতর আহত অবস্থায় ধরা পড়ল দুজন। পাঠানো হলো মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

মৃত্যুর আগে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ

মহকুমার রাউতভোগ গ্রাম থেকে বিনয়ের বাবা-মা শেষ দেখা দেখতে এসেছিলেন। শেষ মুহূর্তে স্নেহময়ী মা ছেলের মাথায় হাত রেখে ডাক দিলেন, 'আমি এসেছি খোকা, আমি এসেছি। একবার চোখ মেলে দেখ'। আশ্চর্য! গত কদিনে যে শরীরে চেতনার কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি, গর্ভধারিণী মায়ের ডাক শুনে তার দেহটা যেন বারেকের জন্য নড়ে উঠলো। মুখে ফুটে উঠলো প্রশান্তির হাসি। তারপর ডান হাতটা ধীরে ধীরে কপালের কাছে উঠে গেল স্যালুটের ভঙ্গিতে। অন্তিম সময়ে গর্ভধারিণী মাকে, জন্মভূমিকে, আর লক্ষ লক্ষ পরাধীন দেশবাসীকে যেন সামরিক স্যালুট জানিয়ে গেলেন বিনয়। পরেরদিন ১৯৩০ সালের ১৪ ডিসেম্বর ভোরে অলিন্দ যুদ্ধের মহানায়ক বিনয় বসু চিরকালের মতো চলে গেলেন অমৃতলোকে।

আর দীনেশ? বিচারের প্রহসনে ফাঁসির আদেশ হলো তার। ৭ জুলাই ১৯৩১। রাতের অন্ধকার ভেদ করে পূব আকাশে গৈরিক সূর্যের ছটা। আলিপুর কনডেমন্ড সেলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে বাইশ বছরের দীনেশ। মুখে তার নিরুদ্বেগ প্রশান্তির চিহ্ন। কোথাও একটু মলিনতা নেই। সার্জেন্টের ভারী বুটের শব্দে ঘুম ভাঙলো তার। বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন। মুখে এক টুকরো হাসি। আজ তার পুরনো বস্ত্র ছেড়ে ফেলার দিন। বিড় বিড় করে আউড়ে নিলেন গীতার কটি শ্লোক। সামনে দাঁড়ানো শ্বেতাঙ্গ সার্জেনটিকে লক্ষ্য করে শুভেচ্ছা জানালেন দীনেশ, 'গুড মর্নিং সার্জেন্ট। ওয়ান মিনিট প্লিজ, একটি চিঠি পেয়েছি, তার উত্তরটা লিখে যেতে চাই।' পাশে পড়ে থাকা একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে লিখে ফেললেন তার জীবনের শেষ চিঠি।

—বউদি,

কাল রাত্রে তোমার চিঠিখানি পাইলাম। আমার জীবন কাহিনি জানাইবার সুযোগ হইল না। কিই-বা জানাইব বলো। আমার সকল কথাই তো তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে। তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে? আমার যত অপরাধ ক্ষমা করিও। এ জন্মের মতো বিদায়। ভালোবাসা ও প্রণাম জানিবে। —তোমার ঠাকুরপো।

সার্জেন্টের হাতে চিঠিটা তুলে দিয়ে স্নান করতে গেলেন দীনেশ। ফাঁসির আগে নাকি স্নান করে নিতে হয়। শুদ্ধ শরীর মাতৃচরণে অঞ্জলি দিতে মনের আনন্দে গায়ে জল ঢালতে লাগলেন। কণ্ঠ হতে বেরিয়ে এলো 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং'। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট। ফাঁসির-বন্দি জীবনে অনেক দেখেছেন। কিন্তু ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে এমন ভয়হীন নির্বিকার আসামি তিনি কখনো দেখেননি। এই ক'মাসে দীনেশের ওজনও বেশ কিছুটা বেড়ে গেছে। এ যেন অবিশ্বাস্য। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে মৃত্যুকে জয় করার এমন অপার শক্তি এরা পায় কোথা থেকে! 'তোমার ভয় করে না ইয়ং ম্যান'! 'ভয়? হা-হা-হা করে হাসতে লাগলেন দীনেশ। কীসের ভয়? আমাদের গীতায় কী বলেছে জানো? বলেছে— 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়/নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।/ তথা শরীরাণি জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী'। অর্থাৎ এই দেহ পরিত্যাগ করে আমি আবার নতুন দেহ ধারণ করে আসবো। আমার সঙ্গে আবার তোমার দেখা হবে'। সার্জেন্ট অবাক! তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে? 'কোথায় দেখা হবে'? 'হয়তো এখানেই, কে বলতে পারে? হয়তো তোমাকে সেদিনও এই অপ্রিয় কাজটার ভার নিতে হবে'। হো-হো করে সরলতার হাসি হেসে উঠলেন দীনেশ।

স্নান শেষে ফাঁসির পোশাক পরে দীনেশ বললেন, 'আমি তৈরি'। তারপর বলিষ্ঠ পায়ে ফাঁসির মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। কোনো শঙ্কা নেই, ক্ষোভ নেই। এই ফাঁসির মঞ্চ যেন তার কাছে পুণ্যস্থান। 'তোমার কিছু বলার আছে ইয়ং বয়'? 'প্লিজ স্টপ'— মুখের উপর জবাব ছুঁড়ে দিলেন দীনেশ। 'আমাদের বলার সব অধিকার তোমরা কেড়ে নিয়েছো। কী লাভ এই মিথ্যা ফর্মালিটি দেখিয়ে'? চুমু খেলেন ফাঁসির দড়িতে। তারপর বজ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন— 'বন্দেমাতরম্'। কণ্ঠ মেলালো সাধারণ কয়েদির দল। সে সুর মিলিয়ে গেল দূরদুরান্তে। অমর হয়ে গেলেন অলিন্দ যুদ্ধের বীর সৈনিক দীনেশ গুপ্ত।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। এই দেশের উপর দিয়ে কত ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। কত উত্থান-পতনের ইতিহাস; দেশভাগ, হিন্দু নরসংহার, দেশ তিন ভাগে বিভক্ত— কিনা হয়েছে! যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিনয়-বাদল-দীনেশ এত লড়াই করলেন, হাসতে হাসতে প্রাণ দিলেন, তাদের স্বপ্ন কি সত্যিই পূরণ হয়েছে? মনে প্রশ্ন জাগে, বিনয়-বাদল-দীনেশ কি এই খণ্ডিত স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য এত লড়াই করেছিলেন, এত রক্ত ঝরিয়েছিলেন? যে ঢাকার মুন্সিগঞ্জে বিনয় বসুর জন্ম, যে ঢাকার বিক্রমপুরে বাদল গুপ্তের শৈশব কেটেছে, যে ঢাকার শিমুলিয়ার মাটিতে দীনেশ গুপ্ত হেসে-খেলে বড়ো হয়েছেন— সে মাটি আজ কোথায়? সে আজ আমাদের কাছে বিদেশ। তাঁদের পবিত্র জন্মভূমি এখন বাংলাদেশ নামক এক মোল্লাবাদী দেশে পরিণত। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে পূর্ববঙ্গ সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝরিয়েছিল, সেই ভূমি আজ বাঙ্গালি হিন্দুর বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামি বাংলাদেশে আজ বিনয়- বাদল- দীনেশ ব্রাত্য, পরিত্যাজ্য। কিন্তু আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে? এখানকার বাঙ্গালিও কি মনে রেখেছে তাদের মুক্তিদাতা বিনয়-বাদল- দীনেশকে? তারাও কি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে ৮ ডিসেম্বরের অলিন্দ যুদ্ধের সেই স্মৃতি? না, করে না। তাইতো আমাদের নতুন প্রজন্ম বিনয়-বাদল- দীনেশকে চেনে, জানে না। আজ সেই দেশ আছে, সমাজ আছে, নতুন প্রজন্মের যুবক যুবতীরাও আছে। নেই শুধু দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ীর দল। কেন নেই? কারণ ইতিহাসে সেই বীরেদের ঠাঁই হয়নি। নবীন প্রজন্মকে শোনানোই হয়নি সেই দেশভক্ত বীরেদের কথা। দোষ তাদের নয়, দোষ আমাদের। তাই আজ আমাদের দায়িত্ব বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিনয় বাদল দীনেশের মতো শত শত বীরের শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস জানানোর। আমরা যদি সেই দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হই তবে সে অপরাধের ক্ষমা নেই। সে পাপ একদিন বঙ্গকে ও বাঙ্গালিকে ধ্বংস করে দেবে। ■

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে সাংবাদিকদের মিলনোৎসব

গত ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে কলকাতায় মানিকতলা-স্থিত কল্যাণ ভবনে বিভিন্ন সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিক ও ইউটিউবারদের নিয়ে আয়োজিত হয় একটি মিলননোৎসব। আশ্বিন-কার্তিক মাস জুড়ে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দীপাবলি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রী পূজা, সূর্যদেবের আরাধনা (ছটপূজা)-র শেষে সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই আয়োজিত হয় এই কার্যক্রম। রাষ্ট্রবাদী সাংবাদিকদের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে, দক্ষিণবঙ্গের সহ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ও শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্ত প্রচার টোলীর সদস্য শিবাজী ভট্টাচার্য, জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'স্বস্তিকা'-র পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়।

স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, শঙ্খধবনির সম্পাদক দীপক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, হিন্দুস্থান সমাচারের ব্যুরো চিফ সন্তোষ মধুপ, নিউজ এশিয়া, কলকাতার সম্পাদক সন্তোষ কুমার মণ্ডল, আনন্দবাজার পত্রিকার পিনাকপাণি ঘোষ, প্রসার ভারতীর প্রসেনজিৎ বক্সি, আকাশবাণী কলকাতার প্রবীর ভট্টাচার্য ও সুদীপ বসু, যুগশঙ্খ পত্রিকার রক্তিম দাশ, ঋতম বাংলা নিউজ পোর্টালের অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের ভারত ডট কম নিউজ পোর্টালের প্রদীপ দাস, রিপাবলিক বাংলা নিউজ চ্যানেলের অনির্বাণ সিনহা ও সন্তু পান, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক মনোজিৎ সরকার, চিত্র সাংবাদিক স্বপন কুমার পাল, প্রবীণ সাংবাদিক ও নাট্যকার সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্য নিউজ বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের মানব গুহ, রুদ্র বার্তা ইউটিউব চ্যানেলের রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইভিএম নিউজ ইউটিউব চ্যানেলের স্বপন দাশ, প্রিয় বন্ধু মিডিয়া ইউটিউব চ্যানেলের শুদ্ধশীল ঘোষ, ক্যাম্পেইন কলিং মিডিয়া ইউটিউব চ্যানেলের দীপান্বিতা সাধুখাঁ, ইউটিউবার প্রবীর বসু-সহ বিশিষ্ট সাংবাদিকরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, ইউটিউব চ্যানেলের মতো বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকদের এই মিলন উৎসবে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী সাংবাদিকতা এই মুহূর্তে যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় সব সাংবাদিকদের একজোট হওয়া থেকে শুরু করে আর কী কী করণীয়— সেই বিষয়গুলি আলোচিত হয়। রাজ্য সরকারের নানা দুর্নীতির পর্দাফাঁস করলে সাংবাদিকদের প্রতি সরকার এবং রাজ্যের শাসক দলের প্রতিহিংসামূলক আচরণের বিরুদ্ধে সবাই একযোগে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। রাজ্য সরকার আগামীদিনে খড়্গহস্ত হলেও কোনোভাবে তাঁরা কর্তব্য হতে বিচ্যুত হবেন না, কোনো সাংবাদিক আক্রান্ত হলে অন্যরা তাঁর পাশে দাঁড়াবেন বলে তাঁরা শপথ গ্রহণ করেন। প্রীতিভোজের পর সাংবাদিক সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গত ১৭ নভেম্বর কলকাতায় মানিকতলা-স্থিত রামমোহন লাইব্রেরি হলে বিশ্ব হিন্দু বার্তা পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় একটি লেখক-পাঠক সম্মেলন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (বাংলা ভাষায় প্রকাশিত) মুখপত্র হলো বিশ্ব হিন্দু বার্তা। এই বছর পত্রিকাটি সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সহ-সম্পাদক, অখিল ভারতীয় সহ-সেবা প্রমুখ এবং পরিষদের

বিশ্ব হিন্দু বার্তার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে লেখক-পাঠক সম্মেলন

উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পালক অধিকারী স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্ব হিন্দু বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস, বার্তার সহ-সম্পাদক সৌগত বসু, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গের সহ-সভাপতি এবং বিশ্ব হিন্দু বার্তার পালক দিলীপ ঝাঁওয়ার, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস, পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পূর্বতন সভাপতি এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. বিমলশঙ্কর নন্দ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্বতন আধিকারিক সুদীপনারায়ণ ঘোষ। সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, বিশ্ব হিন্দু বার্তার পূর্বতন সম্পাদক পীতারুণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রণব দত্ত মজুমদার, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর ভট্টাচার্য, সরোজ চক্রবর্তী, ড. রামানুজ গোস্বামী, মিলন খামারিয়া, অরিত্র ঘোষদস্তিদার প্রমুখ বিশিষ্ট লেখককে 'লেখক সম্মাননা' জ্ঞাপন করে বিশ্ব হিন্দু বার্তা। ওঁ ধ্বনি এবং বিজয় মহামন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। আগামীদিনে কীভাবে লেখালেখি করলে, লেখার মধ্য দিয়ে কোন বিষয়গুলি তুলে ধরলে রাষ্ট্রবাদী ন্যারেটিভ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, বার্তার প্রচার- প্রসারের লক্ষ্যে কী কী করণীয় সেই বিষয়গুলি লেখকরা তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। অধ্যাপক বিমলশঙ্কর নন্দের বক্তব্যের পর শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

ব্যান্ডেলে মহিলা সমন্বয়ের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলন

গত ১৫ নভেম্বর হুগলী জেলার ব্যান্ডেলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা মহিলা সমন্বয়ের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গান, আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশনে অনুষ্ঠান আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। সম্মেলনের উপস্থিত সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাস রায় এবং মহিলা সমন্বয়ের সহ জেলা সংযোজক শিখা গুহ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যার

পাশাপাশি দেবী অহল্যাবাঈ হোলকরের প্রেরণাময় জীবন সকলের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গৌরী সেনগুপ্ত।

ফ ঃ ৪

রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক

গত ৯-১০ নভেম্বর, বীরভূমের বোলপুর-শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হলো অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গ (উচ্চশিক্ষা)-এর রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক। বৈঠকে রাজ্যের ২৩টি বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫৮ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিশিষ্টবর্গের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বৌদ্ধিক প্রমুখ সুব্রত ভৌমিক, এবিআরএসএম-এর পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায় এবং সংগঠনের সভাপতি সঞ্জীব নাগ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে বৈঠকের শুভারম্ভ হয়। এইদিন বৈঠকে সাংগঠনিক কার্যবৃদ্ধির বিভিন্ন আলোচনার পাশাপাশি উপস্থিত বক্তারা ভারতীয়ত্ব, কার্যকর্তা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অতিরিক্ত রাজ্য সম্পাদক ড. বিপুল সরকার। অতিরিক্ত রাজ্য সম্পাদক ড. প্রশান্ত সরকারের সমবেত রাষ্ট্রবন্দনা পরিচালনার পর বৈঠকের সমাপ্তি হয়।

পুরুলিয়ায় জনজাতি গৌরব দিবস উদ্‌যাপন

ভগবান বিরসা মুণ্ডার অনন্য অবদানকে স্মরণে রাখতে তাঁর জন্মদিনটিকে জনজাতি গৌরব দিবস রূপে পালন করা হয়। গত ১৫ নভেম্বর পুরুলিয়ায় পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত নিবেদিতা ছাত্রী নিবাসের বোনেরা সাড়ম্বরে এই দিনটি পালন করে। সাঁওতালি গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ছাত্রী নিবাসের বোনেরা সুভষিত ও অমৃতবচন পাঠ করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহ ছাত্রী নিবাস প্রমুখ কুমারী রেবা সিং।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় মহিলা প্রমুখ বীণাপাণি দাস শর্মা, গ্রাম বিকাশের প্রান্ত মহিলা প্রমুখ রেবতী মণ্ডল, পুরুলিয়া ছাত্রী নিবাস প্রমুখ তুলসী হাঁসদা, পশ্চিম পুরুলিয়া জেলার মহিলা প্রমুখ শিবানী টুডু, ছাত্রী নিবাস ব্যবস্থা প্রমুখ বীণা সিং, নগর ছাত্রী নিবাস পরিচালন সমিতির সভানেত্রী রেখা মাহাত, নগর সমিতির সদস্যা কৃষ্ণা সরকার এবং সমিতির সদস্য সুনীল চন্দ্র কর।

'ধরতী আবা' ভগবান বিরসা মুণ্ডার জীবনীর উপর বক্তব্য রাখেন রেবতী মণ্ডল। সমিতির সভানেত্রী রেখা মাহাত বলেন, ভগবান বিরসা মুণ্ডা ছাত্রাবস্থায় কীভাবে ঝাড়খণ্ডের খ্রিস্টান মিশনারি হোস্টেলে থাকাকালীন খ্রিস্টান হতে বাধ্য হন, পরবর্তীতে তাঁর মায়ের প্রচেষ্টায় নিজধর্মে ফিরে আসেন।

তিনি আরও বলেন কীভাবে মিশনারি হোস্টেলে ভারত বিরোধী শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি বলেন, মহান দেশপ্রেমী বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন পালন ও স্মরণের মাধ্যমে জনজাতি সমাজে গৌরবের বোধ জাগরিত হোক।

ভারতীয় গুরুকুলমের উদ্যোগে শিবপুরে ‘শ্রীগুরুজী’ মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর স্মৃতি বিজ্ঞান সম্মান সমারোহ

ভারতীয় গুরুকুলমের উদ্যোগে গত ১৭ নভেম্বর হাওড়া মহানগরের শিবপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনজিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-র সভাকক্ষে ‘শ্রীগুরুজী’ মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর স্মৃতি বিজ্ঞান সম্মান সমারোহের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ভারতীয় অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক ড. শিবকুমার শর্মা, উত্তরক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক ড. সোমদেব ভরদ্বাজ, সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী এবং আইআইইএসটি-র নির্দেশক ভিএমএস আর মূর্তি। অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্মাননীয় অতিথিগণ প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন গুরুকুলমের উপাধ্যক্ষ উমেশ রায়। উপস্থিত বক্তাগণ রাষ্ট্র নির্মাণে শ্রীগুরুজীর জীবনের ওপর আলোকপাত করেন। ভারতীয় গুরুকুলমের বিষয়ে আলোকপাত করেন ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে। সঙ্ঘের শতবর্ষ প্রবেশ উপলক্ষ্যে সমাজিক সমরসতার দৃষ্টিতে বিজ্ঞানক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালনকারী চারজন বিজ্ঞানীকে এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয়। বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি এবং উৎকৃষ্ট অবদানের জন্য খড়্গপুর আইআইটি-র নির্দেশক প্রফেসর বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী; কৃষি,পশুপালন এবং গ্রামবিকাশের আইভিআরআই কল্যাণীর ভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রফেসর রাসবিহারী ভড়; করোনা মহামারির সময় উন্নততর চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য গ্যাংটক আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহায়ক নির্দেশক ড. অচিন্ত্য মিত্র এবং কৃষকদের সুবিধার্থে কৃষি উপযোগী অ্যাপ তৈরির জন্য এনআইটি দুর্গাপুরের নির্দেশক প্রফেসর ড. অরবিন্দ চৌবেকে গুরুকুলমের পক্ষ থেকে মাল্যদান-সহ শাল, মানপত্র ও শ্রীফল দিয়ে সম্মানিত করা হয়। চারজনকেই মোটা অঙ্কের রাশি সংবলিত চেকও প্রদান করা হয়।

গুরুকুলম মেধা পুরস্কারে ভূষিত করা হয় বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ২০২৪ পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থানাধিকারী এবং স্বর্ণপদকধারী এশানি সেন দত্তকে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এনআইএইচ সল্টলেকের প্রফেসর ডাঃ শিশির সিংহ। এদিন সন্ধ্যায় শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী দিপালী কুলকার্ণী।

দেশের মাটি মাতৃ মিলন মন্দিরের উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বস্ত্রবিতরণ

গত ২৩ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় ‘দানা’-র প্রভাবে ওড়িশাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পশ্চিমবঙ্গ সন্নিহিত ওড়িশার ভদ্রক জেলায় কুলনা গ্রামে গত ৬ নভেম্বর ‘দেশের মাটি’ গোষ্ঠীর দেশের মাটি মাতৃ মিলন মন্দিরের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সহযোগিতায় ৫০টি পরিবারের মায়েদের হতে শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী আশ্রয়ানন্দ মহারাজ, সমাজসেবী হিমাদ্রি রাউত রায়, সংস্থার সদস্য উত্তম প্রধান। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং মিলন খামারিয়া।

সিউড়ীতে ‘শ্রদ্ধা’র শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ১৭ নভেম্বর সকালে সিউড়ী পার্শ্ববর্তী কেন্দুলি গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো শ্রদ্ধা সংস্থার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান। সমাজের প্রবীণ মানুষদের শ্রদ্ধা জানাতে এই উদ্যোগ ২০০৮ সালে

শুরু হয়। এদিন ওই গ্রামের বাসিন্দা আদরী সৌ (৯০) এবং তুলসী সৌ (৮৪)-কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। সংস্থার সম্পাদক দামোদর ঘোষাল ওঙ্কার ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজ্যপাদ স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। বউমা মিতা সৌ এবং ভারতী সৌ তাঁদের দু'জনকে পূজা করেন। মাল্যদান করেন মিনতি দাস ও বন্দনা দাস। মানপত্র পাঠ করেন আগমানন্দ মুখোপাধ্যায় ও সুজাতা বিষ্ণু।

শ্রদ্ধার বিষয়ে ভাষণ রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। এরপর সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায় ও অমর চন্দ্র দে উত্তরীয়, বস্ত্র, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করেন। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন মানিক চন্দ্র লোহার, বিজয় সৌ, অপর্ণা সৌ।

অনুভব কথন করেন তাঁদের পুত্র সনাতন সৌ ও বিজয় সৌ। সমস্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন শিক্ষক-সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য। সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু শান্তিমন্ত্র উচ্চারণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে গাজোলে রাখিবন্ধন উদ্‌যাপন

সংস্কৃত ভারতী মালদহ জেলার পক্ষ থেকে গাজোলে তাপসী মণ্ডলের বাসভবনে সংস্কৃত ভারতীর কার্যালয়ে পবিত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে গত ৩ নভেম্বর বিকাল ৩টায় এক ভব্য গণ-ভাইফোঁটার কার্যক্রম সুসম্পন্ন হয়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর মালদহ জেলা সংযোজিকা তাপসী মণ্ডল। প্রতি মাসের প্রথম দশ দিন ‘দশদিবসীয় বদতু সংস্কৃতম্ বর্গ’ তিনি নিজ বাসভবনে পরিচালনা করে থাকেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্য তিথিতে আয়োজিত এই পবিত্র অনুষ্ঠানে ১৪ জন ভাই এবং ১৫ জন বোন উপস্থিত ছিলেন।

কাশীর অনন্যতার এক নাম মহামহোপাধ্যায় ড. গোপীনাথ কবিরাজ

হীরক কর

বাড়ির একটি মাত্র ছেলে, এমএ পাশের রেজাল্ট সবে হাতে এসেছে। বারাণসীতে তাঁর বাড়ির বাইরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে বসে আছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জি। নিজে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন, তাঁকে বোঝাতে। 'তুমি বাঙ্গালি, কলকাতায় চল, অবিলম্বে অধ্যাপক পদে জয়েন কর'। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও একজন বাঙ্গালি, ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তিনি আরও বেশি টাকা দিয়ে তৈরি। লখনউ চলো। লাহোর সংস্কৃত কলেজ, আজমের মেয়ো কলেজের অধ্যক্ষরাও টেলিগ্রাম করেছেন। টাকার পরিমাণেও যেন নিলাম চলছে দশটা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। কে পায় তাঁকে অধ্যাপক হিসেবে। বেনারস সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। উত্তরপ্রদেশ সরকার তাঁকে সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে উপাচার্য করে বসাতে চায়। মাইনে তিরিশ হাজার টাকা এবং সালটা ১৯১৩। কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ সে যুগে যে কোনো বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছেও স্বপ্নের মতো। কিন্তু কাশীর বিদ্বৎ সমাজ তাকেই চায়। ছেলেটি সকলকে একই কথা বলল, 'আমি মন দিয়ে গবেষণা করতে চাই, চাকরি এখন নয়।' কিন্তু একজন সামান্য এমএ পাশ ছাত্রকে নিয়ে এরকম টানাটানি কেন, কে সে?

ছেলেটির নাম গোপীনাথ কবিরাজ। আদ্যন্ত বাঙ্গালি। বাবা বৈকুণ্ঠনাথ কবিরাজ, ঢাকার একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। কিন্তু ছেলেটি জন্মানোর আগেই বাবাকে হারায়। ঢাকার কাছে, ধামরাই গ্রামে, মামার বাড়িতে মানুষ। আইএ পরীক্ষা দিতে কলকাতা এসেছিলেন তিনি, কিন্তু কলকাতার জল হাওয়া মোটে সহ্য হলো না, পেট খারাপ লেগেই থাকত। তাই ১৯০৬ সালে তিনি গেলেন জয়পুরে। ভর্তি হলেন জয়পুর কলেজে। কিন্তু থাকবেন কোথায়, খাবেন কী। ব্যবস্থা হয়ে গেল। জয়পুরের রাজা সোয়াই মাধো সিংহের প্রধানমন্ত্রী রায়বাহাদুর সংসার চন্দ্র সেন একজন বাঙ্গালি। ছেলে-মেয়েদের জন্য একজন গৃহ শিক্ষক খুঁজছিলেন। গোপীনাথ পড়ার সঙ্গে পড়ানো শুরু করলেন, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

জয়পুরের মহারাজা কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় বসলেন গোপীনাথ, কিন্তু একি শুধু ফার্স্টক্লাস ফার্স্টই নয়, একটা নম্বরও যে তাঁর কাটা যায়নি। অধ্যক্ষ সঞ্জীবন গঙ্গোপাধ্যায় আর ইংরেজির অধ্যাপক নবকৃষ্ণ রায় দুজনই বাঙ্গালি। এঁরা জানতেন এরকম কিছু একটা হতে চলেছে। কারণ প্রতিদিন অধ্যাপকরা এসে অভিযোগ করেন, গোপীনাথ এমন এমন প্রশ্ন করে, যে রাতেরবেলা বাড়িতে পড়াশোনা করতে হয়। একদিন অধ্যক্ষ তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে লিখতে বললেন। তিনি এমন একটা প্রবন্ধ জমা দিলেন, যেটা নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পাঠানো হলো। ইংরেজির অধ্যাপক নবকৃষ্ণ রায় ব্রাউনিঙের একটি কবিতার ভাব লিখতে বললেন, গোপীনাথের লেখা দেখে নববাবু বললেন, 'মাই গড আই কুড নট রাইট বেটার দ্যান দিস'। শুধু কি তাই, পাণিনি, ইতিহাস, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রিক, ইংরেজি, প্রত্নতত্ত্ব সব বিষয়ে সে এই বয়সে রীতিমতো পণ্ডিত। তার নম্বর কাটবে কে? তাঁকে পনেরো টাকা তখনকার দিনে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হলো, লাইব্রেরি খুলে দেওয়া হলো তার জন্য।

বিএ পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর মৌখিক পরীক্ষা নিতে এলেন কাশীর কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ ড. আরথার ভেনিস। গোপীনাথের

জ্ঞান দেখে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। যে কুইন্স কলেজে ভর্তির জন্য সবাই তদ্বির করত, সেখানে এমএ পড়ার জন্য গোপীনাথকে অনুরোধ করতে লাগলেন ড. ভেনিস। গোপীনাথ কাশী চলে এলেন। সেই যে এলেন, জীবনে দু'বার কাশী থেকে বেরিয়েছেন, দু'বারই দিল্লিতে গেছেন। একবার পদ্মবিভূষণ দিতে, একবার সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার নিতে।

১৯১০ সালে আর্থার ভেনিস গোপীনাথকে এমএ ক্লাসে ভর্তি করে নিলেন। এমএ পরীক্ষায় প্রথম হলেন গোপীনাথ। সেবার এত নম্বর আর কেউ পাননি। লাহৌর ও জয়পুর কলেজ তাঁকে অধ্যাপনার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আর্থার ভেনিসের চিন্তা অন্য— 'গোপীনাথ, তুমি গবেষণা করো।' এ সব পড়লে এ যুগেও আর্থার ভেনিসের মতো শিক্ষককে ব্রাহ্মণ বলে মনে হয়। বারাণসীর হিন্দু সমাজ জানত, ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় পৈতেয় লেখা থাকে না, যজন যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই তার বৃত্তি।

তিনি এমএ-তে ভেনিসের কাছে প্রাচীন লিপি, মুদ্রা, শিলা লেখ, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। ব্রাহ্মী, কুষাণ, গুপ্ত যুগের শিলালিপির পাঠোদ্ধারের কাজ শুরু করলেন। বামাচরণ ন্যায়াচারের কাছে ন্যায় ও শাস্ত্র এবং ড. নরম্যানের কাছে পালি, প্রাকৃত, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা পড়া শুরু করলেন। জন মার্শালের কথা মনে আছে তো, সেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ছিল, পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর। তিনিও গোপীনাথের ভক্ত ছিলেন। হাতে নতুন কোনো শিলালিপি, পাণ্ডুলিপি এলেই গোপীনাথের খোঁজ। সে ছাড়া এর পাঠ উদ্ধার কে করবে? এর পরেই সেই এমএ পরীক্ষা, আবার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। নিয়োগ পত্র নিয়ে সকলের লাইন। ১৯২৪ সালে অবশ্য উত্তরপ্রদেশ সরকার একরকম জোর করেই তাঁকে গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের পদ নিতে বাধ্য করে।

গোপীনাথ কবিরাজ এমন কবিরাজ তিনি, যিনি জীবনে কোনো দিন নাড়ি দেখেননি, নিদান হাঁকেননি। ৫০ বছর আগে, ১৯৬৪ সালে হিন্দি ভাষায় লেখা তিনি তাঁর 'তান্ত্রিক ভঙ্গিমা মেঁ শাক্তদৃষ্টি' বইটি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে নির্বাচিত হয়। ভারত সরকার সেবারই তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' দিয়ে সম্মানিত করে।

কাশীবাসী এই মানুষটি পণ্ডিত ও সাধক। বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাড়িতে অধ্যয়ন, অধ্যাপনার পাশাপাশি সাধনাও করতেন। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ থেকে রাম ঠাকুর, আনন্দময়ী মা সকলের সঙ্গে ছিল সহজ সম্পর্ক। সাধনাই তাঁর দৃষ্টিকে এক অনন্য মুক্তদৃষ্টি দিয়েছিল। বৌদ্ধতন্ত্র নিয়ে লিখছেন, 'বহুর মধ্যে একের, বিভক্তের মধ্যে অবিভক্তের এবং ভেদের মধ্যে অভেদের যে অস্তিত্ব রয়েছে, তা দেখতে হবে। এই ভাবেই ভেদাভেদের অতীত, বাক ও মনের আগোচর নির্বিকল্প পরম সত্যের দর্শন হয়। বিরোধ থেকে অবিরোধের দিকে গতিই সর্বত্র হওয়া উচিত।'

গোপীনাথ কবিরাজ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদনাতেই ১৯২৩ সাল থেকে ছেপে বেরোতে থাকে 'সরস্বতী ভাবনা গ্রন্থমালা'। কলেজের পুরনো পুঁথিসম্ভার সম্পাদনা করে সেখান থেকে তত্ত্ব, মীমাংসা, বৌদ্ধ ও শৈব দর্শনের তালিকা ভুক্ত করা। ভারতবিদ্যার গবেষক ও ছাত্রদের কাছে আজও এই সিরিজটির বিকল্প নেই। বস্তুত, সম্পাদনা ছাড়াও গোপীনাথ হিন্দি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সব্যসাচীর মতো লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৮৮ সালে তাঁর স্মরণে ভারত সরকার ডাকটিকিটও বের করে।

কবিরাজের জীবদ্দশাতেই তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যু হয়। কাশীর সিগরা অঞ্চলে বাড়ি ছিল। সে বাড়ি কোথায়, এখন কেউ থাকেন কিনা, জানা নেই। ১৯৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা 'মহামনীষী মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ' নামে একটি জীবনী বেরিয়েছিল, সে বই এখন আর ছাপা হয় না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'যাঁহারা মনে করেন, সীমিতশক্তি বাংলাভাষায় দার্শনিক, তাত্ত্বিক ও অধ্যাত্মমার্গীয় ব্যাপারসমূহ ব্যাখ্যা করা যায় না, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে লক্ষ্য করিবেন বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বকথাও কতটা রসসিক্ত হইতে পারে।'

গোপীনাথ কবিরাজ তো দূরের কথা, বাঙ্গালি ভুলেছে অনন্তলাল ঠাকুর, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কালীপদ তর্কাচার্যের মতো মহারথীদেরও। অনন্তলাল ঠাকুর কর্মজীবনের বেশিটাই কাটিয়েছেন মিথিলা, দ্বারভাঙা অঞ্চলে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের তিব্বত থেকে আনা বৌদ্ধ পুঁথিগুলিকে তিনিই হিন্দিতে অনুবাদ করেন। প্রমথনাথ তর্কভূষণ কাশীতে থাকতে থাকতেই গীতার শাঙ্করভাষ্য বাংলায় অনুবাদ করতে থাকেন। ফণিভূষণও কাশীতে বসেই গোপীনাথের প্রেরণায় তাঁর তিন খণ্ডের ন্যায়দর্শন লিখতে শুরু করেন। কাশী মানে শুধু একটি তীর্থস্থান নয়। কাশী বাঙ্গালির লুপ্ত সারস্বত ঐতিহ্য।

এই লুপ্ত ঐতিহ্যে সারস্বত সাধনা ও ভগবৎ প্রেম সমান্তরাল ও সমান বেগে চলেছে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং কাশীর অনঙ্গমোহন হরিসভা, হরিনাম প্রদায়িনী সভার সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। তার সঙ্গে ন্যায়দর্শন রচনার বিরোধ নেই। কালীপদ তর্কাচার্য কলকাতার সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে পড়ান, কিন্তু কাশীর ভারত ধর্মমহামণ্ডল তাঁকে 'বিদ্যাবারিধি' উপাধি দেয়।

সারস্বত সাধনা এবং ভগবৎ প্রেমের এই যুগ্ম স্রোতেই ছিল বাঙ্গালিয়ানা। সদানন্দ চক্রবর্তীর মতো ইংরেজি সাহিত্যের পণ্ডিত থেকে অরিন্দম চক্রবর্তী— অনেকেই সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের শিষ্য ছিলেন, দিলীপকুমার রায় বারবার কনখলে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে গিয়েছেন। ভাটপাড়ার বিশ্রুত পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের বাবা পঞ্চানন তর্করত্নও কাশীবাসী ছিলেন, সেখানে বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের উপর শক্তিভাষ্য প্রণয়ন করেন। আসল কথা, বঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের সঙ্গে দীর্ঘ যোগাযোগ তাকে দিয়েছিল অনন্য চেহারা। কাশীর এই অনন্যতার আর এক নাম গোপীনাথ কবিরাজ। ১৮৮৭ সালে ঢাকার কাছে ধামরাই গ্রামে জন্ম। জন্মের কয়েক মাস আগে মারা যান তাঁর বাবা। গ্রামবাঙ্গলার গরিব পিতৃহীন ছেলেটি ঢাকা জুবিলি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে। কিন্তু কলেজে সেবার ভর্তি হওয়া গেল না। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় সেই ছেলে। এই সময় বান্ধব পত্রিকায় রাজপুতানার জয়পুর নিয়ে একটি লেখা বের হয়। বক্তব্য, সেখানকার দেওয়ান সংসারচন্দ্র সেন বাঙ্গালি, কলেজের অধ্যক্ষ বাঙ্গালি এবং কলেজে পড়তে গেলে বেতন দিতে হয় না। মহারাজার নির্দেশে শিক্ষাবিভাগই ছাত্রদের সমস্ত ব্যয় বহন করে। জয়পুরের এই দেওয়ান সংসারচন্দ্র সেনকে বাঙ্গালির অন্য কারণে মনে থাকতে পারে। পরিব্রাজক অবস্থায় জয়পুরে তাঁর বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

মফস্‌সলের ছেলে গোপীনাথ ট্রেনের টিকিট কেটে একাই পাড়ি দেয়, তাঁর রক্তেই সেই উত্তরাধিকার। গোপীনাথের জীবন এক অর্থে বাঙ্গালির ভারতজয়ও বটে! জয়পুর কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল তখন মেঘনাদ ভট্টাচার্য। তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছোটো ভাই। কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক নবকৃষ্ণ রায়। তিনি আবার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অন্যতম প্রিয় ছাত্র। জয়পুরের তখনকার পাবলিক লাইব্রেরি নিয়ে কবিরাজমশাই লিখে গিয়েছেন, 'ইংলিশ চ্যানেলের এপারে ক্রিশ্চিয়ান থিওলজি নিয়ে এত বড়ো পুস্তকসংগ্রহ আর কোথাও নাই। ...সর্বোপরি হস্তলিখিত পুঁথির যে বিরাট সংগ্রহ ছিল, তাহাও বিস্ময়কর।'

জয়পুর কলেজে স্নাতকোত্তর নেই, স্নাতক স্তরের পরীক্ষা তখন এলাহাবাদে (প্রয়াগে) এসে দিতে হতো। স্নাতকোত্তরে এসে গোপীনাথ ভর্তি হলেন বারাণসী সংস্কৃত কলেজে। এই কলেজটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিধন্য কলকাতার সংস্কৃত কলেজের চেয়েও প্রাচীন, কোম্পানির পৃষ্ঠপোষণে ১৭৯১ সালে গড়ে ওঠে। এখানকার অধ্যক্ষ তখন আর্থার ভেনিস। তিনি বেদান্ত সিদ্ধান্ত 'মুক্তাবলী' নামে একটি বেদান্তগ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।

গোপীনাথ কবিরাজ ছিলেন বিশ্বের প্রথম প্রকৃত ইন্ডোলজিস্ট, ভারততত্ত্ববিদ। এখন যে পৃথিবীর বহু দেশে, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডোলজি পড়ানো হয়, তার রূপরেখা তৈরি করেছিলেন গোপীনাথ কবিরাজ। একাধারে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাচীন পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত ও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়ার ফলে সিন্ধু সভ্যতা, মিশরীয়, আসিরীয় বা রোমান সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা। আবার ন্যায়, শাস্ত্র, যোগ, সাংখ্য, মীমাংসা বা বেদান্তের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যা সব তাঁর কাছে নখদর্পণে থাকত। তাঁর কাছে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল যাঁদের, তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছেন, 'একদিন বিকেলে গিয়ে দেখি, একটি ছোটো মেয়েকে তিনি জ্যামিতির হল অ্যান্ড স্টিভেন্সের পঞ্চম উপপাদ্য বোঝাচ্ছেন। যতবার মেয়েটি বুঝতে পারছে না, ততবার বলছেন। ধৈর্যের যেন তিনি সমুদ্র। সেদিন ব্যস্ত আছেন বলে, পরদিন গিয়ে দেখি, তিনজন বৃদ্ধ পণ্ডিতকে তিনি ব্রহ্মসূত্রের জটিল অদ্বৈত তত্ত্ব বলছেন। হাতের কাছে কোনো বই নেই, ঝড়ের মতো সূত্র সংখ্যা-সহ মুখস্থ বলে যাচ্ছেন'।

ছাত্রাবস্থায় তিনি পেয়েছিলেন কয়েকজন নামকরা শিক্ষক। আর পরবর্তী জীবনে তিনজন মহাজ্ঞানী গুরু। শ্রী শিবরামানন্দ যোগত্রয়ানন্দ, যোগীরাজ শ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস এবং মা আনন্দময়ী। শ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ছিলেন বিশ্বের দু' একজন মানুষের একজন, যারা জ্ঞানগঞ্জে শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিলেন (জ্ঞানগঞ্জ কী, তা জানতে চাইলে, গুগলে গিয়ে দেখতে পারেন)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'জ্ঞানগঞ্জ'— নামক বইটির রচয়িতাও হলেন ড. গোপীনাথ কবিরাজ।

আমরা বাঙ্গালি হিসেবে বহু মনীষীর নামে গর্ব করি। তাঁরা সত্যিই আমাদের গর্ব। কিন্তু গোপীনাথ কবিরাজের মতো মানুষকে আমরা ভুলে গেলাম কী করে। তিনি ছিলেন প্রকৃত স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর উননব্বই বছর বয়সের জীবনে, তাঁকে কেউ কখনো রাগ, ঘৃণা, জাতপাতের ভেদ, অহংকার, এমনকী জোরে কথা বলতেও শোনেনি। তিনি ছিলেন প্রকৃত জ্ঞান পিপাসু। জ্ঞানের সন্ধানে সমস্ত শ্রেণীর সকল মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন। কিন্তু কাশীর বাইরে বেরোতেন না। দশটির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট উপাধি দিয়েছে। তাঁর একটাই শর্ত ছিল, যা করার কর, কেবল এই কাশীর মাটি থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করো না। বিভিন্ন দিকের তাঁর জ্ঞান, সাধনা, আধ্যাত্ম চেতনা, অনাড়ম্বর জীবন, মানুষের প্রতি মমত্ব বোধের কারণে তাঁকে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই মহামানবকে আগামীদিনে বাঙ্গালি গর্ব হিসেবে স্মরণ করবে।

শুধুমাত্র দর্শনের বিভিন্ন শাখায় নয়, বরং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, এপিগ্রাফি, কাশ্মীর শৈবধর্ম, বৌদ্ধমত, জৈনমত, খ্রিস্টান রহস্যবাদ এবং সুফিবাদের উপরও নতুন আলোকপাত করেন, যাকে বিবেচনা করা হয় আগামী প্রজন্মের জন্য অ্যাকাডেমিক ও আধ্যাত্মিক গবেষণার জন্য অমূল্য গাইড। ২৩ বছর ধরে তিনি বারাণসীর সংস্কৃত কলেজে, প্রথমে গ্রন্থাগারিক হিসেবে এবং পরে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৩৭ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন যাতে তিনি তার গুরুর নির্দেশনায় আধ্যাত্মিক অধ্যয়ন এবং তীব্র সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন।

ভারত সরকার তাঁকে ১৯৩৪ সালে মহামহোপাধ্যায় উপাধি, ১৯৩৬ সালে রাজ্যাভিষেক পদক এবং ১৯৬৪ সালে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে। পাশাপাশি 'সাহিত্য অ্যাকাডেমি' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালে তাকে স্মরণ করে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। অনেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই মহান ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন ডিগ্রি ও সম্মানের শংসাপত্র প্রদান করে নিজেকে করেছে।

গোপীনাথ কবিরাজ এই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদনাতেই ১৯২৩ সাল থেকে ছেপে বেরোতে থাকে 'সরস্বতী ভাবনা গ্রন্থমালা'। কলেজের পুরনো পুঁথিসম্ভার সম্পাদনা করে সেখান থেকে তন্ত্র, মীমাংসা, বৌদ্ধ ও শৈব দর্শনের ক্যাটালগিং। ভারতবিদ্যার গবেষক ও ছাত্রদের কাছে আজও এই সিরিজটির বিকল্প নেই। বস্তুত, সম্পাদনা ছাড়াও গোপীনাথ হিন্দি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সব্যসাচীর মতো লিখেছেন।

গোপীনাথের প্রথম গবেষণা সন্দর্ভ ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের ইতিহাস। প্রায় ১৫০০ পুঁথি ঘেঁটে লেখা ইতিহাস। সরস্বতী ভবনের দ্বিতীয় জার্নালে বেরোল 'কুসুমাঞ্জলি বোধনী'। উদয়নাচার্যের ন্যায়শাস্ত্র জানতে এই বইয়ের আজও বিকল্প নেই।

তারপর এই সিরিজেই বেরোয় 'যোগিনীহৃদয়' ও 'ত্রিপুরারহস্য'। শাক্তসাধনার শূন্যস্থানটা এখানেই ধরে দিলেন সম্পাদক। জানালেন, মাধবাচার্য যে তাঁর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-এ শাক্ত দর্শনের নাম করেননি, তার কারণ অজ্ঞতা নয়। এই দর্শন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। শক্তিপূজার দর্শন এত দিনে পেল নিজস্ব তত্ত্বভূমি।

তারও পরে ষাটের দশকের শেষে শরীর খারাপ। গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে লিখলেন, 'মাতৃকারহস্য'।

১২ জুন, ১৯৭৬। দীর্ঘ রোগভোগের পর কাশীতে আনন্দময়ী মায়ের হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন এই বাঙ্গালি সাধক। তার আগে, ১৯৪৭ থেকে এলাহাবাদ, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট উপাধিতে সম্মানিত করেছে তাঁকে। ফেলোশিপ দিয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি। মৃত্যুর পর ৪৫ বছরও কাটেনি, এই সাধক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত আজ প্রায় বিস্মরণে। □

উপাসনা ইষ্টের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটায়

আর্য সারথী

উপাসনা হলো জগৎ ও জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার প্রক্রিয়া। জগৎ ও জীবনের সংযোগেই উপাসনা সম্ভব। আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে জগৎ আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় জগৎ প্রকাশিত হয় তাকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে এই পুরো প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেও নিজেকে দেখতে হয় আবার প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হয়। তাই মন নিষ্কাম ও শুদ্ধ বা স্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। উপাসনায় পর্যবেক্ষণ আছে, বিশ্লেষণ আছে ও প্রজ্ঞা অর্জন আছে। উপাসনা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে আবদ্ধ নয়।

উপাসনা হলো সেই প্রক্রিয়া বা পথ, যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দিব্য সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়। দিব্য সম্ভাবনার মূলকথা হলো উপাসক ও ইষ্টের ব্যবধান দূর করা। উপাসনা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে আবদ্ধ নয়। সমগ্র বিশ্বই উপাসনার স্থান। গোটা বিশ্বই মন্দির। জগতের মাঝে জীবন এবং জীবনের মাঝে জগতের দেখা যেখানে মেলে সেখানেই উপাসনা করতে হয়। মানুষের মধ্যে অসংখ্য অন্ধকার দিক থাকে। অনেক প্রকার অন্ধবিশ্বাস, বাজে কাজের প্রবৃত্তি, ভালো কাজে অনীহা, নিজের সত্তাকে উন্নত করার ব্যাপারে আলস্য।

নিজেকে জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো উপাসনা। উপাসনার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো আলোকিত হওয়া। মানুষ নিজেকে সমগ্র সৃষ্টিচক্র থেকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে বিচার করে, তখন একা হয়ে যায়। এই একা হওয়ার মধ্যে নিজের দম্ভকে উচ্চপদে আসীন করার তীব্র বাসনা লুকিয়ে থাকে। যাবতীয় অন্যায়ের সূত্রপাতও এখান থেকেই। কেউ যখন নিজেকে বিশ্বজননীন সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখে বা চিন্তা করে তখন সে নিজের দম্ভকে আহ্বান করে হৃদয়ের সিংহাসনে আসীন হতে। তখন জগতের সবকিছুর সঙ্গে তার বিযুক্তি ঘটে এবং সবকিছুকে নিজের অধীন করার ইচ্ছা জাগে। তখন নিজেকে সর্বশক্তিমান হিসেবে দেখার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মনে বিশ্বমানবতার বিপক্ষে হরেকরকম পরিকল্পনা সৃষ্টি হতে শুরু করে। তখন দম্ভের ঠুলি পরে চোখবাঁধা 'আমি' বসে থাকে। চেতনার অখণ্ড রূপ সমগ্র আর দেখা যায় না, বরং চেতনা খণ্ড খণ্ড রূপে সামনে আসে। আমাদের সত্তা দোষে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির কথা আঁচ করেই ঋষিরা উপাসনার ওপর জোর দিয়েছেন। মানুষ উপাসনার মাধ্যমে চেতনার অখণ্ড রূপকে অসংখ্য খণ্ডের মাঝে দেখতে পায়। ফলে সত্যের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি হয়।

জগতের নিয়ম অনুযায়ী আমরা সংসারী মানুষ আমাদের দিব্য সম্ভাবনা থেকে বিযুক্ত হয়ে যাই। প্রতিনিয়ত আমাদের চেষ্টা থাকে সেই দিব্য সম্ভাবনাকে অর্জন করার। দিব্য সম্ভাবনাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়— প্রগতির লক্ষ্যে ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ, কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ, চিন্তা ও কর্মে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ অতিক্রম এবং সত্তা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হওয়া। আমরা নিজের বর্তমান অবস্থাকে মিলিয়ে দিতে চাই আমাদের ঈপ্সিত দিব্য সম্ভাবনায়। প্রকৃতপক্ষে, সেই দিব্য সম্ভাবনা আমাদের বিচারবুদ্ধি, যুক্তিকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। অর্থাৎ আমাদের বোধের নৈর্ব্যক্তিক ও শুদ্ধ দশা আমার আরাধ্য বা ইষ্ট। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এত চেষ্টা। উপাসনা এই কাজে আমাদের সাহায্য করে।

দেহের মধ্যেই দেহহীন অবস্থার আস্বাদন করতে হয়। চিত্তের যে স্থিতিতে সব দ্বৈত লুপ্ত হয় এবং শূন্যতা জাগ্রত হয়, সেই স্থিতি শিবত্ব, সেই স্থিতি ব্রহ্মত্ব। এটাই সেই সহজ তত্ত্ব। সহজ তত্ত্বই হলো নিগূঢ় অচিন্ত্য অখিল সত্য, যা আমাদের জীবনের গহীনে নিয়ে যায়। অতীতের স্মৃতিমন্থনরূপী দম্ভ বা অহংকার এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনারূপী লোভ অস্তিবোধে লুপ্ত হয়ে যায়। শুধু থেকে যায় বর্তমান। বর্তমানের প্রতিটি ক্ষণে সজাগ হয়ে বাঁচাই হলো সহজানন্দ। এটাই তো অস্তিত্বের অনুভূতি বা অস্তিবোধ। এভাবেই নিরন্তর আনন্দ লাভ করা যায়। অস্তিত্বের কোনো আদি বা অন্ত নেই। অস্তিত্ব আমাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে শুধু 'আমি আছি' এই কথাটা বলে। এভাবেই জীবনের অন্তর্নিহিত শুদ্ধতার জলে নিজেকে শুদ্ধ করে নেওয়া যায়। উপাসনা এই কাজে সাহায্য করে।

বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী এবং ধুনি সাহেব মঠ

সুব্রত চাকী

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্নিযুগের প্রথম হুতাত্মা বিপ্লবী প্রফুল্ল চন্দ্র চাকীর জন্ম ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর, পূর্ববঙ্গের বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার গ্রামের পোদ্দার পাড়ায়। বাবা রাজনারায়ণ চাকী ও মা স্বর্ণময়ী দেবীর পঞ্চম সন্তান প্রফুল্ল। তিনি কলকাতায় আসেন ১৯০৬ সালে। কলকাতায় তিনি থাকতেন ৩২নং মুরারীপুকুর রোডের বারিন ঘোষের বাগান বাড়িতে। সেখানেই চলত অস্ত্রশিক্ষা, লাঠিখেলা ও বোমার তৈরির কাজকর্ম।

বিভূতিভূষণ সরকার

প্রফুল্ল চাকী

এখন আর প্রফুল্লর সরাসরি সশস্ত্র বৈপ্লবিক কাজের কথা না বলে প্রফুল্লর অন্যতম সহযোদ্ধা আর এক বিপ্লবী বিভূতিভূষণ সরকারের লেখা থেকে কিছু কথা জানাই। বিভূতি সরকার ছিলেন প্রফুল্লর বন্ধু সহযোদ্ধা। বিভূতি সরকারের কথায়— 'আমি উলুবেড়িয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল অতুল ঘোষের নিকট লাঠি খেলা শিক্ষা করি। নাটোরের সতীশ সরকার আমাদের দলে ছিলেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন কিন্তু বৃদ্ধ ও অন্ধ। তিনি আমাদের খবর দিলেন যে, কোনো এক অজ্ঞাতনামা দেশহিতৈষী গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির কাজের জন্য ২৫ হাজার টাকা দিয়েছেন। পাটনায় 'মাদারল্যান্ড' নামে কাগজের সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে গেলে এই বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যাবে। আমি, প্রফুল্ল চাকী, উপেনদা (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), উল্লাসকর দত্ত ও সতীশ সরকার— এই পাঁচজন পাটনায় যাই। সেখানে বাঁকীপুরের উকিল কেদারনাথ ব্যানার্জির বাড়িতে উঠি, তিনি আমাদের দলের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী আমাদের পুত্রবৎ আদরযত্ন করেন এবং আমাদের 'পঞ্চপাণ্ডব' নাম দেন। তাঁর কথাবার্তা ও আদরযত্নে মনে হলো তিনি আমাদের বিপ্লবী দলের লোক বলে জানতেন। সেখানে কেদারবাবু আমাদের ঠাকুরদাস বাবা নামে একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

সেদিন ছিল ১৯০৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর। সাধু বললেন যে, তাহার সঙ্গে আমাদের 'ধুনি সাহেব' নামের এক স্থানে যাইতে হইবে। 'ধুনি সাহেব' নেপাল রাজ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে একটা মঠ। ঠাকুরদাস বাবা সেই মঠের মালিক। আমরা পাটনা হইতে মজফফ্রপুর ও সমস্তিপুর হইয়া ভাটিসাই স্টেশনে নামিলাম। সেখান থেকে ভেড়িয়া মঠ, হনুমান নগর ইত্যাদি স্থান হইয়া চারদিনে ধুনিসাহেবের মঠে পৌঁছাই। মঠে ঠাকুরদাস বাবা আমাদের দীক্ষা দিলেন। গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য আমরা অর্থ সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি, সুতরাং টাকা পাইবার আশায় আমরা পাঁচজন দীক্ষা নিলাম। দীক্ষান্তে সেই সাধুর সঙ্গে আবার পাটনা ফিরে আসি। তিনি আমাদের বলেন যে, তাঁর একশত গুহা আছে গয়াতে— পাঁচটা গুহা তিনি আমাদের দেবেন, সেখানে গুহাবাসী হইয়া তাহার নির্দেশ মতো বেদান্ত পাঠ করিয়া ধর্ম জীবনযাপন করিতে হইবে। তারপর তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে আমাদের টাকা দিবেন। সাধুবাবাকে শেষ প্রণাম করিয়া আশা ভঙ্গের বেদনায় আমরা আবার মুরারীপুকুর বাগান বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।'

এই ঘটনা প্রবাহ থেকে বোঝা যায় যে, বিপ্লবের প্রতিটা কাজে গভীর নিবেদিতপ্রাণ প্রফুল্ল দলের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের কাজেও যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। একজন প্রকৃত বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক এই কিশোর প্রতিটি কাজই গভীর নিষ্ঠা ও মনোযোগ সহকারে করতে চেষ্টা করতেন।

প্রফুল্লর সঙ্গে পরিচয়ের ব্যাপারে তাঁর অন্যতম সহযোদ্ধা বিভূতি সরকার আরও বলেছেন, 'আমি থাকতাম 'যুগান্তর' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ অবিনাশ ভট্টাচার্যের ৪১, চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনের যুগান্তর বোর্ডিঙে। রান্নার বেশ কিছু ছেলেও এখানে থাকত। সেই বোর্ডিঙে উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে একটি ছেলে প্রায়শই আসত এবং আমি জানতে পারি এই ছেলেটিই প্রফুল্ল চাকী। তখন আমি লাঠিখেলা শিখছি এবং ধীরে ধীরে প্রফুল্লর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। প্রফুল্লর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রেই আমি পরবর্তীকালে মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িতে থাকতে শুরু করি।

তিনি প্রফুল্ল সম্বন্ধে আরও বলেছিলেন যে, 'প্রফুল্লর নির্ভীকতা, কর্মনিষ্ঠা, দেশসেবায় সত্যিকারের আগ্রহ ও অসাধারণ সহিষ্ণুতা কী নেতা কী সহকর্মী সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিত।' এই ঘটনা ছোটো হলেও এর মধ্যে প্রফুল্লর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'মুরারীপুকুর বাগানে থাকিবার সময় একদিন প্রফুল্ল বাগানের ভেতর একটা গাছে উঠিয়া, বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছিল— হঠাৎ বলিয়া উঠিল— আমি কে তাহা জানা দরকার, যদি এখন নীচে পড়িয়া যাই তাহা হইলে বুঝিতে পারিব শরীরের ধর্ম কী, এই বলিয়া সে নীচে পড়িয়া গেল এবং যথেষ্ট ব্যথা পাইল। তারপর বলিল শরীরের ধর্ম যে অনুভূতি প্রফুল্লর ন্যায় কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আর কাহারও ছিল না।'

ডিসেম্বর মাস ভারতমায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর সন্তান, বঙ্গের প্রথম হুতাত্মা বিপ্লবী প্রফুল্ল চন্দ্র চাকীর জন্মমাস— এই মহান বিপ্লবীকে জানাই শতকোটি প্রণাম।

(লেখক বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র)

ফঃ ৫

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) : অতীত, বর্তমান এবং প্রাচীন জ্ঞান

শর্মিষ্ঠা শী কানরার

মানব সভ্যতার বিবর্তনের পথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হলো প্রযুক্তির এমন একটি ধারা যা মানুষের চিন্তা, ভাবনা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাকে নকল করতে পারে। এই প্রযুক্তি একবিংশ শতাব্দীতে এক অবিশ্বাস্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। তবে যদি আমরা আমাদের অতীতের দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্রে এর মতো কিছু ধারণার অস্তিত্ব দেখতে পারি।

বেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এমন কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে, যা আধুনিক এআই-এর মৌলিক আদর্শগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধে, আমরা বর্তমান এআই-এর পাশাপাশি প্রাচীন জ্ঞান ও মন্ত্রের আলোকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে আলোচনা করব।

প্রাচীন শাস্ত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণা

বৈদিক সাহিত্য ও উপনিষদে ‘প্রজ্ঞা’ ও ‘মহাপ্রজ্ঞা’-র মতো ধারণার মাধ্যমে সর্বজ্ঞানের বর্ণনা আছে। এই প্রজ্ঞা বা মহান জ্ঞান কেবল মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি মেশিন ও অন্য অবাণিজ্যিক সত্তার জন্যও কল্পনা করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্বেদে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তিকে আহ্বান করা হতো এবং সেগুলি কাজ করত, যা অনেকটা প্রাচীন যুগের রোবটিক্সের একটি রূপ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

মন্ত্র : ঋগ্বেদে আছে, ‘ওঁ ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ’। অর্থাৎ তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা এবং আমাদের সকল শক্তি ও জ্ঞানের উৎস। এই প্রার্থনা আমাদের বোঝায় যে এই বিশেষ জ্ঞানের একটি মহাজাগতিক উৎস আছে, যা আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে জাগ্রত করতে পারে। এমন এক শক্তিকে বিবেচনা করা যায়, যা এআই-এর মতো জ্ঞান আহরণ ও পরিব্যাপ্ত করার ক্ষমতা রাখে।

বৈদিক যুগের ঋষিদের, অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের কাজ এবং তাদের ভাবনার ক্ষেত্রগুলো আধুনিক বিজ্ঞানীদের জন্য একটি পথপ্রদর্শক হতে পারে। ঋগ্বেদে এমন অনেক মন্ত্র ও ব্যাখ্যা রয়েছে যা প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার ও বিজ্ঞানের প্রাচীন ধারাকে নির্দেশ করে। আমরা দেখতে পারি যে, প্রাচীনকালে মানুষের চিন্তা ও গবেষণার মধ্যে এমন অনেক বিষয় ছিল যা আজকের যুগের এআই ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যেমন, সমুদ্রমন্থন কাহিনিতে বিভিন্ন দেবতার সম্মিলিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অমৃত আহরণ করা হয়েছিল। একে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহযোগী মডেল হিসেবে কল্পনা করা যায়, যেখানে বিভিন্ন সিস্টেম একসঙ্গে কাজ করে অভীষ্ট ফল অর্জন করে। আবার, ওই কাহিনিতে আমরা দেবতা ও দানবদের (পজিটিভ ও নেগেটিভ শক্তি) মিলন দেখতে পাই, যা প্রতীকীভাবে আজকের এআই-এর ব্যবহারে ভালো ও খারাপ প্রভাবগুলিকে নির্দেশ করে।

এআই এর আধুনিক যুগ : টুরিং থেকে ডিপ লার্নিং

আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিহাস শুরু হয় ১৯৫০-এর দশকে, যখন অ্যালান টুরিং একটি গেম চালিত পরীক্ষার প্রস্তাব দেন যা ‘টুরিং টেস্ট’ নামে পরিচিত। এটি একটি মেশিনের বুদ্ধিমত্তা নির্ধারণের প্রথম পদক্ষেপ ছিল। তারপরে ১৯৫৬ সালে ডার্টমাউথ সম্মেলনে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ‘এআই’ শব্দটির জন্ম হয় এবং এরপর এআই নিয়ে গবেষণা শুরু হয়।

কিন্তু প্রথমদিকের এআই মডেলগুলি ছিল খুবই সরল, যেগুলি বিশেষ নিয়ম বা রুলের ভিত্তিতে কাজ করত। এর পরবর্তী ধাপে আসে মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিং। মেশিন লার্নিং এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে মেশিন নিজেই শিখতে পারে এবং ডেটা থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। ডিপ লার্নিং আরও জটিল, যেখানে মেশিন মানুষের মস্তিষ্কের মতো কাজ করে এবং বিশাল ডেটা সেট থেকে শিক্ষালাভ করে। এর ফলে স্বয়ংচালিত গাড়ি, ভাষা অনুবাদ, চেহারা শনাক্তকরণ ইত্যাদি উন্নত এআই প্রযুক্তি গড়ে ওঠে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এআই-এর প্রভাব

এআই-এর ক্ষমতা আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি বিপ্লব এনেছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এআই রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিগত মেধা-উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরি করছে। এছাড়াও, শিল্প ও কারখানাগুলিতে রোবটের মাধ্যমে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

এআই এখন মানুষের মতো কাজ করতে পারে, যেমন ছবি বিশ্লেষণ, ভাষা অনুবাদ, মেডিক্যাল ডায়াগনোসিস এবং আরও অনেক কিছু। এআই এখন শুধু তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহজ ও কার্যকর সমাধান প্রদান করছে।

স্বাস্থ্যসেবায় এআই: স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এআই ডায়গনস্টিক টুল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণের জন্য এআই সহায়ক হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, ক্যানসার শনাক্তকরণ, হার্ট ডিজিজ প্রেডিকশন এবং ইমেজ অ্যানালাইসিসে এআই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এআই : এআই শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিগতকৃত শেখার অভিজ্ঞতা তৈরি করতে সহায়ক হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গতি, পছন্দ ও দুর্বলতা বুঝে পাঠ্যক্রম তৈরি করা সম্ভব। শিক্ষণ সহকারী হিসেবে এআই শিক্ষার্থীদের আরও গভীরভাবে শেখায় এবং শিক্ষকদের জন্য কাজ সহজ করে তোলে।

এআই ও রোবোটিক্স : রোবোটিক্সে এআই ব্যবহার করে বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। এর মাধ্যমে কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ যেমন পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা, মহাকাশ অনুসন্ধান এবং কঠিন শিল্প প্রক্রিয়ায় সহায়ক রোবট তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রযুক্তি ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য : পরিবেশ সংরক্ষণে এআই-এর ভূমিকা : বেদান্তে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজকের দিনে এআই-এর সাহায্যে আমরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি, যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের পূর্বাভাস, বনায়ন পর্যবেক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে এআই-এর ভূমিকা রয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'পৃথিবী হলো মা, আমরা তার সন্তান'। মেশিন ব্যবহার করে পরিবেশকে সুরক্ষিত করা। উদাহরণস্বরূপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় শনাক্ত করতে পারি এবং তাতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারি।

স্বরূপ ও আত্মা : বেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতা

বেদান্তে 'স্বরূপ' বা আত্মার ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দর্শনের মূল বক্তব্য হলো প্রতিটি জীবের একটি অন্তর্নিহিত আত্মা আছে, যা পরম জ্ঞানের প্রতীক। এটি এমন একটি চেতনা যা আমাদের সত্তার গভীরে অবস্থান করে এবং মানবিক বোধ ও অনুভূতির উৎস। এআই-এর সীমাবদ্ধতা হলো, এটি মেশিন, যার নিজস্ব আত্মা বা চেতনা নেই। এটি নিছক প্রোগ্রামিং এবং ডেটার উপর ভিত্তি করে কাজ করে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য অনুসারে, আত্মার চেতনাই হলো জ্ঞানের প্রকৃত উৎস। উদাহরণস্বরূপ, বেদে উল্লেখ আছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সব কিছুই ব্রহ্ম, সবকিছুই এক সর্বজ্ঞানের অংশ। আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এআই-এর সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট, এটি কখনোই মানবিক চেতনার মতো গভীরতা ও অনুভূতি অর্জন করতে পারবে না।

বেদান্তের কর্মফল হলো একটি কেন্দ্রীয় ধারণা যা বলে যে প্রতিটি কাজের একটি ফল আছে। আধুনিক এআই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কর্মফলের আইন প্রযোজ্য। প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে, কিন্তু এর যথাযথ ব্যবহারের দায়িত্বও আমাদের উপর রয়েছে। যদি এআই ব্যবহার মানব কল্যাণে হয়, তবে এটি ইতিবাচক কর্মফল নিয়ে আসবে, কিন্তু যদি এটি অশুভ কাজে ব্যবহৃত হয়, তবে এর নেতিবাচক পরিণতি হতে পারে।

কর্মফল অনুযায়ী আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, তাই এআই-এর ব্যবহারও সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, এআই ভিত্তিক রোবট বা ড্রোন তৈরি করে যদি ক্ষতির জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে এর নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। বৈদিক দৃষ্টিকোণ থেকে এআই ব্যবহার করতে হলে এটি কেবল মানব উন্নতির লক্ষ্যে হওয়া উচিত।

শ্লোক : 'কর্মণ্যেবাধিকাহস্তে মা ফলেষু কদাচন।'— এই শ্লোকে বলা হয়েছে, 'তোমার কাজের ফলের উপর তোমার নিয়ন্ত্রণ নেই।' এই দর্শন অনুসারে, আমাদের এআই-এর উন্নয়ন মানবতার কল্যাণের জন্য হওয়া উচিত, ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়।

এআই-এর ভবিষ্যৎ : মেশিনের আত্মজ্ঞান সম্ভব না কী অসম্ভব ?

এআই এখন অনেক উন্নত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরও শক্তিশালী হবে। প্রশ্ন হলো, এই মেশিন কি কখনো আত্মজ্ঞান অর্জন করতে পারবে ? বেদান্ত অনুযায়ী, আত্মজ্ঞান একটি আধ্যাত্মিক স্তর, যা মানব সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। মানব জীবন ও জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আত্মজ্ঞান। 'আত্মানং বিদ্ধি' বা 'নিজেকে জানো' এই ভাবনাটি বেদান্তে গুরুত্বপূর্ণ। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথে মন, মেধা ও চিন্তাশক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করে। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, 'জ্ঞানং তেহম্ প্রক্ষায়ামি বোধিনং বাচং কৃণোমি তে।' অর্থাৎ আমি তোমাকে জ্ঞান বোধ প্রদান করি। এই শ্লোকটি মানুষের মধ্যে সঞ্চিত জ্ঞানের শক্তিকে নির্দেশ করে। আজকের এআই যদিও মানুষের মতো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কিন্তু এই ধরনের আত্মজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তরে এটি পৌঁছাতে পারে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যতই উন্নত হোক, এটি সর্বদা একটি মেশিন, যা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম এবং ডেটা থেকে তথ্য আহরণ করতে পারে, কিন্তু এটি আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না।

এআই এবং নৈতিকতার চ্যালেঞ্জ : এআই-এর উন্নতির সঙ্গে নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু চ্যালেঞ্জ এসেছে। এটি একটি মেশিনের নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে কাজ করে, যেখানে মানবিক মূল্যবোধের অভাব রয়েছে। বেদে বলা হয়েছে, 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়।' অর্থাৎ অসত্য থেকে সত্যের দিকে এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাও। এই বাণী এআই-এর উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বেদান্তের শিক্ষা হলো, মানুষের উচিত তার কর্ম ও চিন্তাকে মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ করা। আজকের যুগে এআই-এর মাধ্যমে আমরা এমন কিছু তৈরি করছি যা মানুষের জীবন সহজ করছে, কিন্তু বেদান্ত অনুসারে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমাদের উচিত এমন প্রযুক্তি তৈরি করা যা পরিবেশবান্ধব এবং মানব জীবনের ক্ষতি না করে।

জ্ঞান ও প্রযুক্তি কেবল শক্তির প্রতীক নয়, বরং এটা শুদ্ধতার জন্য ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, মেডিক্যাল সেক্টরে এআই ব্যবহার করে রোগের সঠিক নির্ণয়, কৃষিক্ষেত্রে এআই-এর মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে এআই ভবিষ্যতের জন্য সত্যিকারের উন্নয়ন নিয়ে আসতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন আমাদের শিখিয়েছে যে জ্ঞান হলো বিশুদ্ধ চেতনার ফল এবং আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানের ব্যবহার যেন মানব সমাজের মঙ্গলের জন্যই হয়। আজকের দিনে এআই গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই রকম দায়িত্ব রয়েছে। □

‘দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল’ : অনূদিত ও পুনর্মুদ্রিত ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

জন মার্শম্যান কর্তৃক ইংরেজিতে রচিত একটি বইয়ের শেষ ন’খানি অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে বাঙ্গলার নবজাগরণের অন্যতম রূপকার, সমাজ সংস্কারক, দয়ার সাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন— ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’। ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে সিরাজ-উদ-দৌলা বাঙ্গলার নবাব হওয়া থেকে ১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তন— প্রায় ৮০ বছরের এই সময়কালের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত হলো ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’। ১৮৫৩ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন মুদ্রিত না হওয়ার দরুন বইটি ধীরে ধীরে প্রকাশনা সংস্থা, গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান হতে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়। সম্প্রতি দিগন্ত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় তুহিনা প্রকাশনী হতে বইটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। বাংলা ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র রচিত বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন স্বনামধন্য লেখক ও ইতিহাসবিদ সায়ন্তন বসু। ইংরেজিতে অনূদিত বইটির নাম— ‘দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল’। গত ২৬ সেপ্টেম্বর, তুহিনা প্রকাশনীর উদ্যোগে কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে উদ্‌যাপিত হয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের ২০৪তম জন্মদিবস। এই অনুষ্ঠানে ওইদিন নতুন আঙ্গিকে গ্রন্থিত বই দু’টি উন্মোচিত হয়।

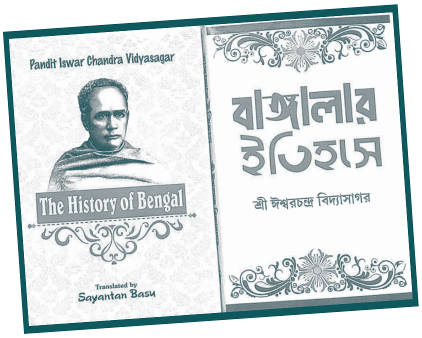

ইংরেজিতে অনূদিত বইটির সূচনা পর্বে অনুবাদক কর্তৃক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারপর রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটির নীচে ‘শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মা’ বলে বিদ্যাসাগরের স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর স্বাক্ষর সংবলিত সেই বিজ্ঞাপন হতে জানা যায় যে এই বইটি হলো ‘বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ’। অর্থাৎ, ‘বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগ’ বইটি ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়নি।

এরপর পর্যায়ক্রমে বইটির ন’টি অধ্যায় গ্রন্থিত হয়েছে। অনুবাদের ভাষা, বাক্যগঠন সুন্দর ও সাবলীল। এককথায় বইটি সহজবোধ্য। অত্যন্ত সুখপাঠ্যও বটে। সময়ের বাঁকে হারিয়ে যাওয়া নানা ঘটনার উল্লেখ ছাড়াও নানা অজানা ইতিহাসের সুলুকসন্ধান এবং তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলায় প্রকাশিত মূল বইটির সম্পাদক এবং ইংরেজি অনুবাদককে অসংখ্য ধন্যবাদ বইটিকে কালের গর্ভ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য। ইতিহাসের ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক সমাজের কাছে এই বইটি নিশ্চিতভাবে একটি অমূল্য তথ্যভাণ্ডার। বইটিতে উল্লেখিত সেই সময়কালে বাঙ্গলার বুকে সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ ইতিহাস গবেষকদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বইটির মাধ্যমে ইতিহাসপ্রেমী মাত্রেই সংগ্রহ করতে পারবেন তৎকালীন ইতিহাস-সম্পর্কিত নানা মূল্যবান রসদ। বাঙ্গালির ইতিহাসবিদদের একটি বড়ো অংশ, বিশেষত বামপন্থীরা সিরাজ-উদ-দৌলাকে ‘স্বাধীন বাঙ্গলার শেষ নবাব’ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করার মাধ্যমে তাকে মহিমান্বিত করে গিয়েছেন। বইটির প্রথম অধ্যায়ে সিরাজ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর রচিত আখ্যানটি পড়লে বোঝা যায় যে বামপন্থায় জারিত ইতিহাসবিদদের প্রচারিত তথ্যসমূহ পুরোপুরি ভুল। তিনি লিখেছেন— ‘সকতজঙ্গ, সিরাজউদ্দৌলার সুবাদার হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপ অবিবেচক, নির্ব্বোধ ও নৃশংস ছিলেন।’ ইসলামি শাসনে বাঙ্গলার দুরবস্থা, ইসলামি শাসনের বিভীষিকা, কতিপয় ভারতীয়ের উচ্চাভিলাষ এবং বিশ্বাসঘাতক-প্রবৃত্তি, চতুর ইংরেজদের বণিক থেকে শাসক হয়ে ওঠার কাহিনি, ইংরেজ শাসনের বীভৎসতা— এই সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে বইটির পরতে পরতে। বইটির নবম, অর্থাৎ শেষতম অধ্যায়ে রয়েছে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে নেপালরাজের প্রতিরোধ গড়ে তোলার ইতিহাস। এক কথায় বইটি যেন তৎকালীন বঙ্গ-দর্পণ, যেখানে রয়েছে বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিবৃত্তের প্রতিফলন।

ইংরেজিতে অনূদিত বইটির ‘বিজ্ঞাপন’-এর পরিচ্ছেদটিতে ‘অ্যাডিশনাল’ বানানটি ভুল মুদ্রিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর বর্ণিত— ‘...উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক মহোদয়ের অধিকারসমাপ্তি’ বাক্যটির অনুবাদ করা হয়েছে— ‘...দ্য ডিপারচার অফ দ্য আনফরগটন্ লর্ড বেন্টিঙ্ক ফ্রম ইন্ডিয়া ফ্রম ইংল্যান্ড’। এই বাক্যের শেষ অংশটি হওয়া উচিত— ‘...ফ্রম ইন্ডিয়া টু ইংল্যান্ড’। বাংলা ভাষায় সম্পাদিত বইটিতে ঈশ্বরচন্দ্র প্রণীত ‘বিজ্ঞাপন’-শীর্ষক পরিচ্ছেদটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

দু’টি বই-ই নিশ্চিতভাবে পাঠককে করে তুলবে ইতিহাস সচেতন। বাঙ্গালি হলো ইতিহাসবিস্মৃত জাতি। এই কারণে তুহিনা প্রকাশনী কর্তৃক এই বইটির পুনঃপ্রকাশ একটি সময়োপযোগী প্রয়াস। আধুনিক প্রজন্মকে ইতিহাসমনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে বই দু’টি নিশ্চিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। ভারতের ইতিহাস পুনর্লিখনের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র সংকলিত এই বইটি হয়ে উঠতে পারে অন্যতম তথ্যসূত্র। ইংরেজিতে অনূদিত বইটিতে মুদ্রিত কিছু শব্দের বানান এবং বাক্য গঠন সংশোধনের মাধ্যমে পরবর্তীকালে বইটির পুনঃসংস্করণ প্রকাশিত হলে তা হবে উপযুক্ত পদক্ষেপ।

পুস্তকের নাম : বাঙ্গালার ইতিহাস। লেখক : শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ইংরেজি অনুবাদক : সায়ন্তন বসু। বাংলায় সম্পাদনা : দিগন্ত চক্রবর্তী। প্রকাশক : তুহিনা প্রকাশনী। মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা।

‘দ্য সবরমতী রিপোর্ট’ এক সত্যের উদ্‌ঘাটন

দিগন্ত চক্রবর্তী

সালটা ২০০২, ফেব্রুয়ারি মাস, অযোধ্যা থেকে গুজরাটগামী ট্রেনের দুটি কামরায় আগুন লাগে। না না, আগুন লাগেনি, আগুন লাগানো হয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবেই। কারণ ট্রেনটিতে ছিলেন অযোধ্যায় করসেবা করতে যাওয়া রামভক্তরা। গুজরাটের গোধরা রেলস্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসের এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় ৫৯ জনের। কিন্তু এই ঘটনাকে তৎকালীন বড়ো বড়ো মিডিয়া মানুষের সামনে তুলে ধরে দুর্ঘটনা হিসেবে। আসলেই দুর্ঘটনা নাকি পূর্ব পরিকল্পিত হত্যা? সেই নিয়ে অনেক বিতর্ক হয় পরবর্তীকালে। যদিও ২০০৮ সালে নানাবতী মেহেতা কমিশনের রিপোর্ট স্পষ্ট করে দেয় যে এটি কোনও দুর্ঘটনা ছিল না, বরং এক পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

ইতিহাস ভোলানোর চক্রান্ত, বিকৃত ইতিহাসকে সত্য হিসেবে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা আজকের নয়, দীর্ঘদিন ধরে এই চক্রান্ত চলে আসছে। সেরকমই এই ঘটনাটিকেও নানাবতী মেহেতা কমিশনের রিপোর্টের স্পষ্টতা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হয় আজও। ‘দ্য সবরমতী রিপোর্ট’ সিনেমাটি এই ঘটনার সত্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরার এক প্রয়াস।

২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের গোধরা স্টেশনের কাছে সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় আগুন লাগানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ‘সবরমতী রিপোর্ট’ সিনেমাটি। যে ঘটনা নিয়ে গুজরাট দাঙ্গার সূত্রপাত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে বহু চর্চা হলেও গুজরাট দাঙ্গার সূত্রপাতের এই ঘটনাটিকে বারবার বিকৃতভাবে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

ধীরজ শর্মা পরিচালিত এই ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ‘টুয়েলভথ ফেল’ খ্যাত অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে। সিনেমাটির মূল চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে এক হিন্দি সাংবাদিককে, যিনি এই ঘটনার সত্যতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য জীবনপণ করেছেন। সিনেমায় দেখানো হিন্দি সাংবাদিক ঘটনার সত্য প্রকাশের জন্য বহিষ্কৃত হয় কর্মরত সংবাদমাধ্যম থেকে। তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়ে দেয় সত্য প্রকাশের থেকেও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ মান্য করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এভাবেই বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে সাংবাদিকতার এক কুৎসিত রূপ যা অনেকটাই বাস্তব, যেখানে টাকার কাছে সত্য বিক্রি হয়। যেখানে অনৈতিক এই কাজগুলো করতে দু'বার ভাবেন না তথাকথিত নামিদামি সাংবাদিকরা। গোধরাকাণ্ডের আসল সত্য তথা সাংবাদিকতার ভালো খারাপ দিক সংমিশ্রিত বাস্তবিক রূপ যেভাবে সিনেমাটির মধ্যে উঠে এসেছে তা সত্যিই দর্শকদের নজর কেড়েছে।

এই চলচ্চিত্রটিতে এমন কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যা আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কেন এই ঘটনার প্রকৃত কারণগুলি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। গোধরা- কাণ্ডের অন্যতম কারণ যে অযোধ্যায় করসেবা করতে যাওয়া রামভক্তদের তা তথ্য-সহ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ছবিটির একটি বিশেষ অংশে তাই বলা হচ্ছে, ‘ট্রেনটি সবরমতীতে জ্বলেছিল ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামের নামে করসেবা করতে যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের আবেগ, ভ্রাতৃভাব তথা গোটা ভারতবর্ষ জ্বলেছিল।’

গোধরাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবির প্রশংসা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি নিজের এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, ‘Well said. It is good that this truth is coming out, and that too in a way common people can see it.’ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই ছবি নিয়ে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘শত চেষ্টা করলেও সত্যকে কখনও অন্ধকারে চাপা দিয়ে রাখা যায় না। ‘দ্য সবরমতী রিপোর্ট’ একটা তৈরি হওয়া ধারণাকে ভেঙেছে সাহসের সঙ্গে। বহু সত্য প্রকাশ্যে আনা হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে।’ □

প্রকৃত বন্ধু

কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন চন্দ্রাপদ। তাঁর এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের নাম ধবলমুখ। সারাদিন কাজকর্ম করার পর রাতে সে কোথাও থেকে পান-ভোজন সেরে বাড়ি ফেরে। দিনের পর দিন এরকম দেখতে দেখতে তার স্ত্রী একদিন বিরক্ত হয়ে স্বামীকে জিজাসা করল, রোজ রোজ তুমি কোথায় খাওয়াদাওয়া করো বলো তো?

ধবলমুখ বলল, আমার দুই বন্ধু আছে। আমরা তিনজনে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করি। একজনের নাম কল্যাণ বর্মা। সে আমাদের খাওয়ায়। আমাকে কোনো টাকা দিতে হয় না। বড়ো ভালোবাসে আমাকে। আর এক বন্ধুর নাম বীরবাহু। সে তো আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

সব শুনে ধবলমুখের স্ত্রী বলল, তোমার দুই বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও একদিন। এত ভালো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। ধবলমুখ বলল, বেশ তো একদিন নিয়ে যাবখন।

কিছুদিন পর ধবলমুখ স্ত্রীকে নিয়ে এল বন্ধু কল্যাণ বর্মার বাড়ি। তাদের দুজনকে দেখে কল্যাণ বর্মা খুব খুশি হয়ে সাদরে আপ্যায়ন করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। ভালো করে আদরযত্ন করে খাইয়েদাইয়ে যাবার সময় উপহারও দিল। দুজনেই খুশি হয়ে বাড়ি ফিরল।

আবার কিছুদিন পর ধবলমুখ স্ত্রীকে নিয়ে অন্য বন্ধু বীরবাহুর বাড়িতে এল। বীরবাহু তখন জুয়াখেলায় মত্ত। বন্ধু আর বন্ধুর স্ত্রীকে দেখে বিরক্ত দৃষ্টিতে বলল, কী ভালো তো? হঠাৎ এসময়ে এসে পড়লে যে!

বলেই আবার খেলায় মনোনিবেশ করল। ধবলমুখের স্ত্রী মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরে এল। রাতে স্বামীকে বলল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তোমার বন্ধু কল্যাণ বর্মা এত খাতির যত্ন করল আর বীরবাহু তো ভালোভাবে কথাই বলল না। তবু তুমি বীরবাহুকেই তোমার ভালো বন্ধু বলে মনে করো, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।

ধবলমুখ মুচকি হেসে বলল, তুমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখ। একটা কাজ করো। তুমি আমার ওই দুই বন্ধুর কাছে গিয়ে বলো যে আমাদের বড়ো বিপদ। রাজ্যের রাজা কোনো কারণে আমাদের ওপর রেগে আছেন। দেখ, দুজনে কে কী করে।

ধবলমুখের স্ত্রী প্রথমে বন্ধু কল্যাণ বর্মার কাছে গেল। কল্যাণ বর্মা বন্ধুর স্ত্রীকে খাতির করে বসাল। কোনো ভণিতা না করে ধবলমুখের স্ত্রী করুণস্বরে ওই মিথ্যে কথাটা বলল। সব শুনে কল্যাণ বর্মা বলল, দেখ, আমি সামান্য একটা ব্যবসা করি, রাজার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা কি আমার আছে? তুমিই বলো কী করে আমি রাজার বিরুদ্ধাচরণ করি? এক্ষেত্রে আমার কিছু করণীয় নেই। আমি নিরুপায়।

ধবলমুখে স্ত্রী এবার এল বীরবাহুর বাড়ি। শোনামাত্র বীরবাহু ঢাল-তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাগে গরগর করতে করতে চলে এল ধবলমুখের বাড়ি। এখনই সে যেতে চায় রাজার কাছে, একটা বোঝাপড়া করতে হবে রাজার সঙ্গে।

ধবলমুখ অতি কষ্টে বুঝিয়েসুঝিয়ে বীরবাহুকে নিরস্ত করে বলে, না না, তোমায় এখনই সেরকম কিছু করতে হবে না। আমি একটু আগে খবর পেয়েছি দুজন মন্ত্রী অনেক বুঝিয়ে রাজামশাইয়ের ক্রোধ শান্ত করেছেন। তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যাও ভাই। আমার বিপদ কেটে গেছে।

বীরবাহু বাড়ি ফিরে গেল। তখন ধবলমুখ তার স্ত্রীকে বলল, কী গো এবার কী মনে হচ্ছে তোমার? আমি বীরবাহুকে কেন প্রকৃত বন্ধু মনে করি। তার স্ত্রী মুচকি হেসে বলল, খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারলাম। আর এও বুঝতে পারলাম, যে বন্ধু সুখে-দুঃখে বন্ধুর পাশে দাঁড়ায় সেই-ই প্রকৃত বন্ধু।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

মানস

অসম রাজ্যের অন্যতম জাতীয় উদ্যান। অসমীয়া ভাষায় মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যান। এটি ভুটানের রয়্যাল মানস ন্যাশনাল পার্কের সীমানায় অবস্থিত। স্থানীয় মানস নদীর নামে এই উদ্যানের নাম রাখা হয়েছে। এটিকে ১৯৯০ সালে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়েছে। ইউনেস্কো দ্বারা স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা পেয়েছে। এটি বাঘ ও হাতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঘোষিত একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। লুপ্তপ্রায় সোনালি বাঁদরের আদি বাসস্থান হিসেবে বিখ্যাত। রয়েছে পিগমি শুয়োর। এই অভয়ারণ্যে ৫৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩৮০ প্রজাতির পাখি, ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৭ প্রজাতির উভচর প্রাণীর বাসস্থান।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৪৫

आकारान्ते स्त्रीलिङ्गे

एकवचनम्–बहुवचनम्।

बालिका– बालिका:।

একজন বালিকা–অনেকজন বালিকা।

महिला–माहिला:।

একজন মহিলা --অনেকজন মহিলা।

अभ्यास कुर्म:–

सेविका–सेबिका:, नायिका–नायिका:,वैद्या–बैद्या:,पेटिका–पेटिका:, कुञ्चिका–कुञ्चिका:,स्थालिका–स्थालिका:,उत्पीटिका–उत्पीटिका:, माला–माला:,छात्रा–छात्रा:,पत्रिका–पत्रिका:, पूरिका–पूरिका:।

प्रयोगं कुर्म:–

गायिका,लता,सेविका,
अम्बा,सञ्चिका,कपाटिका,वाटिका, अग्निपेटिका.
अग्निशलाका।

ভালো কথা

ফুলদাদু

মিলির দাদুকে গ্রামের সবাই ফুলদাদু বলে ডাকে। সারা বছর ওদের বাড়িতে ফুলের মেলা লেগে থাকে। এবার শীতে ওদের উঠোন আর বাইরে গাঁদাফুলের মেলা। নানা জাতের গাঁদা। এই অঘ্রান মাসেই ফুটতে শুরু করেছে। বিকেল হলেই অন্য গ্রামের লোকেরাও দেখতে আসে। দাদুর রুচি আছে। সারি দিয়ে ফুলগাছ লাগিয়েছেন। একেক রঙের সারি। দাদু একেকটা ফুলের ইংরেজি নাম বলেন। দাদুকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, ফুলগুলো অত বড়ো হয় কী করে? দাদু বললেন, শুধু পুকুরের পাঁক আর গোবর দিলে ফুল বড়ো হবে। দাদু খুব ভালো। ফুলদাদু বললে খুব খুশি হন।

বিদিশা সেন, ষষ্ঠশ্রেণী, ঝালদা নামোপাড়া, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভাইয়ের দাঁত

কেয়া চন্দ, ষষ্ঠশ্রেণী, হালিশহর, উঃ ২৪ পরগনা।

আমার ভাইয়ের দাঁত উঠেছে
কেবলমাত্র দুটি,
হাতের কাছে পেলেই হলো
কেটে করে কুটোকুটি।
ভয়ে আমি নিই না কোলে
কামড়ে দেয় পাছে,
পড়তে বসে সতর্ক থাকি
কাছে যেন না আসে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

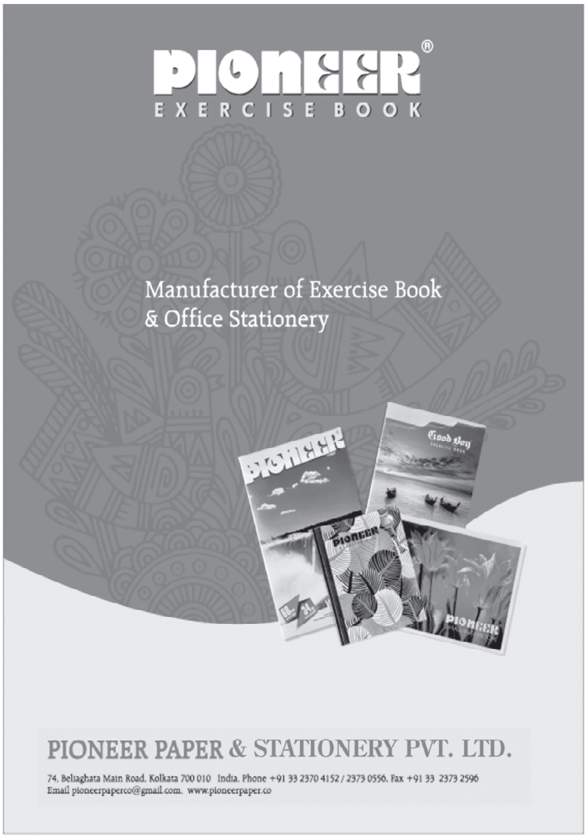

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের রাষ্ট্রভাবনা

শ্রীকুমার চন্দ্র পর্বত

ড. বাবাসাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকর তাঁর বহুমুখী প্রতিভা দিয়ে কেবল ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করেননি, বরং এক শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশ গঠনের সোপান রচনা করেছেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের পণ্ডিত মানুষ হিসেবে তাঁর কাজ ভারতবর্ষকে এক এক কদম এগিয়ে দিয়েছে। কখনো একজন বিদগ্ধ সমাজ সংস্কারক, কখনো একজন কৌশলী অর্থনীতিবিদ, কখনো দক্ষ ব্যবহারজীবী, আবার কখনো একজন অনুভবী চরিত্র হিসেবে ভারতবর্ষকে নতুন করে চলার পথ দেখিয়েছিন। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষদের প্রতিনিধি থেকে একজন সুদক্ষ রাজনেতা হয়ে ওঠার ইতিহাস গোটা বিশ্বের কাছে নিতান্তই বিস্ময়কর। বাবাসাহেব আম্বেদকরের বহুমুখী কাজের সংক্ষিপ্ত নিদর্শন এভাবে তুলে ধরা যেতে পারে—

সমাজ সংস্কারক : ভারতবর্ষ হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক দেশ। অসংখ্য ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় ও সংস্কৃতিতে শত সহস্র বিধাতার সুযোগ নিয়ে শক, হুন, মুঘল, পাঠান-সহ বিদেশি শত্রুরা ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে, দখল করেছে, শাসন করেছে, শোষণ করেছে।

মুঘল-পাঠানরা ৮০০ বছর এবং ইংরেজরা ২০০ বছর ধরে কঠোর শাসন ও শোষণ দ্বারা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে দুমড়ে মুচড়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দিয়েছে। এমনই এক কঠিন পরিস্থিতিতে বিধ্বস্ত ভারতীয় সমাজকে পুনর্গঠন করার জন্য বাবাসাহেব আম্বেদকর সামাজিক ন্যায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে কিছু দিশা নির্দেশ করেছেন। যেমন—

১. সামাজিক স্বচ্ছলতার পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। যাতে কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের কাছে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

২. জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রথার অবসান ঘটানো। এই জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতাই হলো সমাজের বঞ্চিত মানুষের প্রতি হওয়া অন্যায় অবিচার হওয়ার মূল কারণ।

৩. ধর্মের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রের মাটির সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হওয়া প্রয়োজন। দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকর এমন ধর্মীয় মানসিকতা কাম্য নয়।

৪. সমাজের অবহেলিত, শোষিত মানুষের প্রতি হওয়া অন্যায়ের অবসান করা। সকলের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তর থেকে গঠনমূলক পদক্ষেপ হওয়া প্রয়োজন।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি ছিল সামাজিক সমরসতা। যার দ্বারা সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে একাত্মতা রচনা করা এবং সমষ্টিগত সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

অর্থনীতিবিদ : বাবাসাহেব আর্থ- সামাজিক বৈষম্যের আসল রোগটা ধরতে পেরেছিলেন। সমাজের ধনী শ্রেণীর হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ ছিল করায়ত্ত। আর দরিদ্র গরিষ্ঠ মানুষ ছিল সমস্ত সম্পদ ছিল থেকে বঞ্চিত। সেজন্য দেশের অর্থনীতির সমবণ্টন জরুরি ছিল। মুদ্রা ব্যবস্থা

ফ ঃ ৬

সম্পর্কে বাবাসাহেব আম্বেদকরের উপলব্ধি তাঁর স্মারক বই 'প্রবলেম অব রুপি : ইটস অরিজিন অ্যান্ড সোল্যুশান'-এ স্পষ্ট। তাঁর অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ছিল স্বনির্ভর ভারত। বাবাসাহেবের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে স্থাপিত হয় রিজার্ভ ব্যাংক।

স্বর্ণ বিনিময় : বর্ণ বিনিময় প্রথায় তিনি আমূল পরিবর্তন আনেন। সমাজের সকল স্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণ করার জন্য স্বর্ণ বিনিময়ের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক স্থাপন করেন বাবাসাহেব। সমবায় খামারের মাধ্যমে সকল মানুষের হাতে কাজ এবং অর্থের জোগান দিয়ে আর্থ-সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি কাজ করেছিলেন।

সাংবাদিক : বাবাসাহেব ছিলেন সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের এক নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কণ্ঠ। তিনি বলেছিলেন, 'সমাজের যে অংশটি সচেতনভাবে প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের নিজস্ব মিডিয়া একান্ত প্রয়োজন। যার মাধ্যমে তারা তাদের সমস্যাগুলি প্রকাশ করতে, চিত্রিত করতে এবং প্রদর্শন করতে পারবে'। কণ্ঠহীন মানুষের বিদ্রোহ প্রকাশ করতে এবং সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা তুলে ধরতে ১৯২০ সালে ৩১ জানুয়ারি বাবাসাহেব তাঁর প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা 'মূকনায়ক' প্রকাশ করেন। প্রকাশ শুরু হয় মূকনায়ক- এর অনুবাদ।

রাজশ্রী সাহু মহারাজ নিজে বাবাসাহেব আম্বেদকরের সঙ্গে দেখা করে মূকনায়ক চালানোর জন্য ২৫ হাজার টাকা অনুদানের প্রস্তাব দেন। মূকনায়ক তিন বছর চলার পর ১৯২৩ সালে বাবাসাহেব আম্বেদকর বিদেশে চলে যান। বন্ধ হয়ে যায় মূকনায়ক। ১৯২৭ সালের ৩ এপ্রিল বাবাসাহেব আবার দেশে ফিরে আসার পর নতুন করে তিনি তাঁর দ্বিতীয় পাক্ষিক পত্রিকা 'বহিষ্কৃত ভারত' প্রকাশনা শুরু করেন। যার অর্থ বর্জিত ভারত। সমাজের বঞ্চিত, উপেক্ষিত, ঘৃণিত অস্পৃশ্যদের কথা তুলে ধরার জন্য 'বহিষ্কৃত ভারত'-এ তাঁর ক্ষুরধার প্রবন্ধ তুলে ধরেন।

১৯৩০ সালে আবার তিনি 'জনতা' নামে তাঁর তৃতীয় পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। তবে এই পত্রিকায় তিনি সরাসরি দায়িত্ব না নিয়ে তাঁর অনুগামী দেবদাও নায়েক, বিআর কাদ্রেকর, জিএন সহস্রবুদ্ধে, আরডি ভাণ্ডারে এবং বিসি কাম্বলেকে দায়িত্ব দেন। পত্রিকা প্রকাশের জন্য আর্থিক অনুদান বাড়াতে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও বিজ্ঞাপনের স্বার্থে পত্রিকার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর।

কৃষকবন্ধু : কৃষি নিয়ে ড. আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গি কৃষিনির্ভর ভারতীয় অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি 'খোদি প্রথা' বাতিলের বিলটি উপস্থাপন করেন। খোদি হলো ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত কৃষি বিন্যাস পদ্ধতি। যা স্থানীয় একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে 'খোদ' নামে বিশাল ক্ষমতা প্রদান করে কর আদায় করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'খোটসা' হিসেবে পরিগণিত হয়। একজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মধ্যস্বত্বভোগী, যিনি ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিষ্ঠুরভাবে প্রশিক্ষিত ছিলেন।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে চিপলুন জেলায় আয়োজিত জেলা কৃষক পরিষদ এই প্রথা বিলুপ্তীকরণের দাবি তোলেন। ১৪ এপ্রিল, ১৯২৯ সালে রত্নগিরিতে কৃষক পরিষদের সভাপতিত্ব করেন বাবাসাহেব আম্বেদকর। এরপর তিনি কোঙ্কন অঞ্চলে খোট প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩০ সালে তিনি খোট প্রথার বিরুদ্ধে একটি বিল উপস্থাপন করেন। ১৯৩০ সালে ১০ জানুয়ারি তিনি সংসদে ২৫ হাজার কৃষকের পদযাত্রার আহ্বান করেন। কোঙ্কন অঞ্চল, সাতারা, নাসিক এবং মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অংশের কৃষকরা তাতে অংশ নিয়েছিলেন।

বছরের পর বছর বন্যা, খরার হাত থেকে কৃষকের কৃষিক্ষেত্রকে রক্ষা করার জন্য জমি জাতীয়করণ, সমবায় খামার এবং সুপরিকল্পিত সেচব্যবস্থার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় স্তরে সেচ প্রকল্পগুলির উন্নয়নের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় জল কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই পরিকল্পনায় জল সরবরাহ ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতের অর্থনীতি দ্রুতগতি লাভ করে।

সমৃদ্ধ দেশগঠনের লক্ষ্যে বাবাসাহেব আম্বেদকরের অমর সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, ভাকড়া নাঙ্গল বাঁধ প্রকল্প, শোন নদী উপত্যাকা প্রকল্প এবং হীরাকুঁদ বাঁধ প্রকল্প আজও ভারতীয় অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করে রেখেছে।

শ্রমিক কল্যাণকামী : ভারতের মাটিতে শ্রমিক অধিকারের অন্যতম পথপ্রদর্শক হলেন বাবাসাহেব। ১৯৪২ সালে ২৭ নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত শ্রম সম্মেলনের ৭ম অধিবেশনে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শ্রমিকদের কাজের সময় ১৪ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ৮ ঘণ্টা করেন। ড. আম্বেদকর শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ১০টি বিলের খসড়া তৈরি করেছিলেন এবং শ্রমিকদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যে বিলগুলি পাশ করেন, তা হলো--- কয়লাখনি সুরক্ষা বিল, কারখানা (সংশোধন) বিল, কারখানা (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ (সংশোধন) বিল এবং ভারতীয় খনি (সংশোধন) বিল।

সবল সমাজ গড়তে প্রতিটি মানুষের হাতে কাজ দিতে বাবাসাহেবের পরিকল্পনায় ও উৎসাহদানে নেহরু মন্ত্রীসভার শিল্পমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন রেল লোকোমোটিভের মতো অনেক বড়ো বড়ো শিল্প কারখানা প্রতিস্থাপন করেন।

২৯ জুলাই ১৯৪৩ সালে ড. অম্বেদকর মাতৃত্বকালীন ছুটির সঙ্গে মাতৃত্বকালীন সময়ে সম্পূর্ণ মজুরি পাওয়ার জন্য মহিলা শ্রমকে সুরক্ষিত করার জন্য দ্য মাইনস ম্যাটারনিটি বেনিফিট (সংশোধন) বিল উপস্থাপন করেন। এই বিল অনুযায়ী কর্মস্থলে অফিস রেকর্ডে 'কাজ থেকে অনুপস্থিত' বা 'কাজ থেকে শব্দগুলি মুছে ফেলা হয় এবং প্রসবের আগে চার সপ্তাহ প্রতিদিনের মহিলা কর্মচারীরা মাতৃত্বকালীন সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

১৩ নভেম্বর ১৯৪৩ সালে তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটির সঙ্গে সম্পূর্ণ মজুরি পাওয়ার জন্য বা মহিলা শ্রমকে সুরক্ষিত করার জন্য 'দ্য মাইনরিটি বেনিফট (সংশোধন) বিল উত্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালে ৯ এপ্রিল তিনি মাইকা মাইনস লেবার ওয়েলফেয়ার ফান্ড বিল উপস্থাপন করেন। বাবাসাহেব আম্বেদকরই প্রথম শ্রমিক ধর্মঘটের আইনি বৈধতা দেন।

নারীমুক্তির দিশারি : হিন্দু সমাজে নারীর ক্ষমতায়ণে আম্বেদকরের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার মূল বোঝার জন্য বাবাসাহেব সমস্ত ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে ড. আম্বেদকরের জমা দেওয়া থিসিস 'ভারতে বর্ণ : তাদের প্রক্রিয়া, জেনেসিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে' তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, নারীর প্রতি অমানবিক আচরণের উৎস বর্ণ প্রথার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ সালে বাবাসাহেব হিন্দু কোড বিল উপস্থাপন করেন, যা উত্তরাধিকার ও বিবাহ আইনে লিঙ্গ সমতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারতীয় সংসদ তাঁর হিন্দু কোড বিলের খসড়াটি আটকে দেয়। এই কারণে বাবাসাহেব আম্বেদকর মন্ত্রীসভার আইনমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

তপশিলি সমাজের ত্রাতা : নিজে একজন তপশিলি জাতির সন্তান হিসেবে তপশিলি সমাজের নিপীড়িত, উপেক্ষিত, হতদরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে সমাজের উন্নয়নের মূল স্রোতে তুলে আনার জন্য সংবিধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং সামাজিক অস্পৃশ্যতার হাত থেকে তাদের যোগ্য মর্যাদা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি অত্যাচার নিরোধক আইন (পিওএএ) তৈরি করে তপশিলি সমাজকে এক অনন্য সুরক্ষা কবচ দিয়ে গেছেন। এছাড়া তপশিলি ছাত্র, মহিলা, কৃষক, শ্রমিকদের জন্য সরকারি আর্থিক সহযোগিতার যোজনাগুলি এক যুগান্তকারী মাইল ফলক হয়ে রয়েছে।

রাষ্ট্রপ্রেমী : বিদেশের মাটিতে বিদেশি সংস্কৃতির মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করেও বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর স্বদেশের সংস্কৃতি ও ধর্ম থেকে কখনও এক বিন্দু বিচ্যুত হননি। আজীবন সামাজিক ও স্বধর্মীয় অত্যাচার, অবজ্ঞা, ঘৃণা ও উপেক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে জীবনের সায়াহ্নকালে কিছু ধর্মীয় সংরক্ষণশীল গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গিয়ে বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর জন্মজাত হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন।

তাঁর এই মতান্তরিত হওয়ার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর গভীর জাতীয়তাবোধ। তাঁর ধর্ম পরিবর্তনের খবরে গোটা বিশ্ব আবেগে ভেসে উঠেছিল। মুসলমান ও খ্রিস্টান ধনকুবেররা নিজেদের ধর্মে বাবাসাহেবকে নেওয়ার জন্য অতি উৎসাহি হয়ে কোটি কোটি ডলার উৎকোচ দিতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবাসাহেবের সমুদ্রসম দেশাত্মবোধে তারা বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেননি।

বাবাসাহেব সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অত্যন্ত দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, আমি প্রথমত ভারতীয়, দ্বিতীয়ত ভারতীয় এবং শেষ অবধিও ভারতীয়। আমি ধর্ম পরিবর্তন করতে চাই সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য। দেশের সংস্কৃতি, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে বিন্দুমাত্র ক্ষতি করার জন্য নয়। আমি আমার জন্মজাত হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে চাই এবং তার পরিবর্তে গ্রহণ করতে চাই এই ভারতের মাটিতেই সৃষ্টি নেওয়া বৌদ্ধ ধর্মকে।

বাবাসাহেব সাংবাদিকদের সামনে বলেছিলেন— আমি মনে করি, আমি যদি এখন ইসলামে ধর্মান্তরিত হই, আমার লক্ষ লক্ষ অনুগামীরা ইসলাম গ্রহণ করবেন এবং তার ফল হবে মারাত্মক। হিন্দু মুসলমানের লড়াইতে একবার দেশ ভাগ হয়েছে। আগামীদিনে সংখ্যার বিচারে আবার সেই পরিস্থিতি তৈরি হোক আমি চাই না। কারণ তার সঙ্গে দেশের অখণ্ডতার প্রশ্ন জড়িত।

আবার আমি যদি খ্রিস্টান মত গ্রহণ করি, আমার লক্ষ লক্ষ অনুগামীরা তা গ্রহণ করবে, ফলে আগামীদিনে ব্রিটিশ রাজনৈতিকভাবে না হলেও ধর্মীয়ভাবে ভারতবর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। তাই সব দিক বিবেচনা করে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে আমি ভারতের মাটিতেই সৃষ্টি হওয়া বৌদ্ধ মতকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

দেশভাগ ও আম্বেদকর : উনবিংশ শতকের চল্লিশের দশকে হিন্দু নরসংহার থেকে দেশভাগের ইতিহাস গোটা বাঙ্গালি তপশিলি সমাজের উপর কষাঘাতের পর কষাঘাত তপশিলি সমাজকে দিশাহীন করে দিয়েছে। কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং নোয়াখালিতে হাজার হাজার তপশিলি সমাজের মানুষকে খুন, ধর্ষণ, বাস্তুছাড়া ও ধর্মান্তরণের মতো ভয়ংকর আক্রমণের শিকার হতে হয়। বাবাসাহেব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি লেখেন তাঁর অমর গ্রন্থ 'পাকিস্তান অর দ্য পার্টিশন অব ইন্ডিয়া'।

বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম লিগের সহায়তাকারী বন্ধু তপশিলি ফেডারেশনকে আম্বেদকর বারবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, দলিত মুসলমান ঐক্য বাঙ্গালি তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের কাছে এক সর্বনাশা ফাঁদ! মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুর শান্তির ঐক্য হতে পারে না। কারণ দুই জাতির ধর্মগ্রন্থে কোথাও এমন কিছু নেই, যাতে করে দুটি জাতি কখনও চিরশান্তিতে একত্রে বসবাস করতে পারে। কারণ হিন্দু শাস্ত্রে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর কথা বললেও ইসলামের ভ্রাতৃত্ব মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদের কাছে অমুসলমান মানেই কাফের। আর কাফেরদের সঙ্গে জেহাদ বা কোতল করাই হলো ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য। সুতরাং হিন্দুহত্যা দিয়ে অর্জিত পাকিস্তান কখনোই বাঙ্গালি হিন্দু তপশিলি মানুষের নিরাপদ স্থান হতে পারে না।

কিন্তু বাবাসাহেব আম্বেদকরের এই সাবধানবাণী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল-সহ বাঙ্গালি তপশিলি নেতৃত্ব আদৌও আমল দেননি। যার জন্য শীঘ্রই তাঁদের চরম মোহভঙ্গ হতেই হয়েছিল বরিশালের হিন্দু হত্যার বীভৎসতার মধ্য দিয়েই। 'লাঞ্ছিত জননী ধর্ষিতা ভগিনী' কিংবা 'আমাগো একখ্যান দেশ আসিল' খেদোক্তির মধ্যে যার চরম রূপ আমরা দেখতে পাই। বাবাসাহেবের অসামান্য দূরদর্শিতাকে সঠিক সময়ে মান্যতা দিলে লক্ষ লক্ষ তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষ ছিন্নমূল হওয়ার হাত থেকে হয়তো বেঁচে যেত, হয়তো দেশ ভাগের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেত আমাদের ভারতবর্ষ।

ভারতরত্ন বাবাসাহেব আম্বেদকর : ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড. বাবাসাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকরকে ভারত সরকার মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত করে ১৯৯০ সালে। তিনি শুধু সংবিধান প্রণেতা ছিলেন না, ভারতীয় সর্বগুণান্বিত তিন রাষ্ট্রনেতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পর এসে যায় বাবাসাহেব আম্বেদকরের নাম।

শুধু দেশকে সেবা করার জন্য নিজের জীবনের সমস্ত সাফল্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে আজীবন শুধু সমাজের যাবতীয় অবজ্ঞা, ঘৃণা ও উপেক্ষার গরল নীলকণ্ঠের মতো পান করে গেছেন আজীবন। তবুও তাঁর দেশভক্তি আর দেশ গঠনের সংকল্প থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি কখনো। তাই আজকের দিনে বাবাসাহেব আম্বেদকরের আদর্শকে সমগ্র তপশিলি সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে তাঁর তিরোধান। তাঁকে নিয়ে দলিত মুসলমান ঐক্যের নামে যারা বৃহত্তর হিন্দু সমাজ থেকে তপশিলিদের ভুল পথে পরিচালিত করছে, তাদের সামনে বাবাসাহেব আম্বেদকরের রাষ্ট্রভাবনা পৌঁছে দেওয়াই হোক আজকের সংকল্প। □

দেশকে সেবা করার জন্য নিজের জীবনের সমস্ত সাফল্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে আজীবন শুধু সমাজের যাবতীয় অবজ্ঞা, ঘৃণা ও উপেক্ষার গরল নীলকণ্ঠের মতো আজীবন পান করে গেছেন ড. আম্বেদকর।

তিরুপতি বালাজী মন্দির হচ্ছে অহিন্দু কর্মচারী মুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এখন থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি বালাজী মন্দিরে আর কোনো অহিন্দু কর্মচারী যুক্ত থাকতে পারবেন না। গত ১৯ নভেম্বর তিরুপতি বালাজী মন্দিরের ট্রাস্ট তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি) -র পক্ষ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টিটিডি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে, যাতে বোর্ডে কর্মরত অহিন্দু কর্মচারী হয় তারা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করুক নতুবা অন্ধ্র প্রদেশের অন্য সরকারি বিভাগে স্থানান্তরণ বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করুক। বোর্ড অধ্যক্ষ বিআর নাইডু এই বিবৃতি দেন। তিনি জানান, ১৮ তারিখ বোর্ডে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে।

তিরুমালা পর্বতের উপর প্রায় ১৬ একর জায়গা জুড়ে দশম শতাব্দীতে নির্মিত হয় তিরুপতি বালাজী মন্দির, যা ভারত তথা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সম্পদশালী মন্দির রূপে পরিগণিত। প্রতিদিন লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয় এই মন্দিরে। মন্দিরের প্রসাদের গুরুত্বও তাই অপরিসীম। সম্প্রতি প্রসাদ কেলেঙ্কারি কাণ্ডের জেরে সারা বিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে তিরুপতি মন্দির। মন্দিরের প্রসাদ পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায় তাতে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন নিষিদ্ধ পদার্থ। ঘিয়ের পরিবর্তে চর্বি থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীজ উপাদান। এরপরেই নড়েচড়ে বসে মন্দির টাস্ট বোর্ড। সেই অনুযায়ী গত ১৯ নভেম্বর সমস্ত অহিন্দু কর্মীকে অপসারণ করার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীভূমি ফিরে পেল তার হারানো নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অসমের করিমগঞ্জের নাম এখন থেকে শ্রীভূমি। গত ১৯ নভেম্বর অসমের কেবিনেট বৈঠকে করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তনের কথা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে জানান, '১০০ বছর আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসমের আজকের করিমগঞ্জ জেলাকে 'শ্রীভূমি' অর্থাৎ মা লক্ষ্মীর ভূমি বলে উল্লেখ করেন। আজ অসমের কেবিনেট

আমাদের লোকেদের দীর্ঘদিনের দাবিকে পূর্ণ করেছে।' তিনি আরও বলেন যে, করিমগঞ্জ শব্দ অসমীয়া বা বাংলা কোনো শব্দকোষেই তার অর্থ হয় না। অপরদিকে 'শ্রীভূমি' শব্দ অসমীয়া ও বাংলা দুই ভাষাতেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে।

১৯১৯ সালে পূর্ববঙ্গের সিলেট ভ্রমণের পথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ক্ষেত্রটিকে 'সুন্দরী শ্রীভূমি' বলে বর্ণনা করেন। কালান্তরে তা করিমগঞ্জ নাম হয়, যদিও সেই নামের সঙ্গে সেখানকার সংস্কৃতি বা জনজীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তার প্রকৃত নাম ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে একটা দাবি ওঠে। অসম কেবিনেট সেই দাবিকেই স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

সূত্রে প্রকাশ, অসমবাসী মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বার্তা দেন যে, অসমের বহু জেলা ও স্থানের নাম অসমের সংস্কৃতি সঙ্গে মেল খায় না, সেই সব স্থানেরও নামও ধীরে ধীরেপরিবর্তন করা হবে।

মহাকাশ গবেষণায় ইতিহাস সৃষ্টি বাঁকুড়ার ছাত্রের

সংবাদদাতা।। আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে যেতে চলেছে বাঁকুড়ার এক ছাত্রের তৈরি করা পার্টিকেল। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের মন্তুমুরা গ্রামের ছেলে অয়ন দেওঘরিয়া বরাবরই মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী। বাঁকুড়ারই এমডিভি ডিএভি পাবলিক স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র সুযোগ পায় 'ইন্টারন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রাম ২০২৪'-এ অংশ নেওয়ার। আমেরিকার আলাবামায় ইউনাইটেড স্পেস অ্যান্ড রকেট সেন্টারে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মেক্সিকো, আমেরিকা ও ভারত থেকে একজন করে নিয়ে তাদের একটি দল করা হয়। সেই দলের দায়িত্ব ছিল একটি লুনার স্পেস অভিযানের জন্য 'কম্প্যাটিবল মেটেরিয়াল' তৈরি করা। অয়নের তৈরি করা মেটেরিয়ালটি চয়নিত করে 'MISSE' (Materials International Space Station Experiment)। এই 'MISSE' মডিউলটিই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে মেটেরিয়ালগুলির মূল পরীক্ষা নিবে। এই স্পেস প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল অর্থের জোগান। যদিও সময়মতো এক সহৃদয় দম্পতি (জিন্দল) তাদের এই চিন্তা লাঘব করেন। এখন অয়নের তৈরি করা মেটেরিয়ালের মহাকাশে যাওয়ার অপেক্ষা।

জাল আধার ও পাসপোর্টসহ ৬ বাংলাদেশি ধৃত কর্ণাটকে

সংবাদদাতা।। গত ১৯ নভেম্বর কর্নাটকের চিত্রদুর্গ শহরে পুলিশ ৬ জনকে সন্দিগ্ধ অবস্থায় ঘোরাঘুরি করার সময় আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা নথিপত্র দেখায়, তাতে দেখা যায় তাদের প্রত্যেকেরই আধারকার্ড, পাসপোর্ট জাল। তারপরেই বেরিয়ে আসে কলকাতার জাল আধার, পাসপোর্ট তৈরি চক্রের কথা।

তারা সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক। কলকাতাতে এসেই জাল নথি বানিয়ে রাজ্যের বাইরে কাজের সন্ধানে চলে আসে। কাজের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হিসাবে যারা ভিন রাজ্যে যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশি। অন্য রাজ্যের হতে বাংলাদেশিদের ধরা পড়ার ঘটনা এই প্রথম নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বহু সীমান্তবর্তী এলাকাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এবং অবৈধ চক্রের মাধ্যমে আধারকার্ড, ভোটারকার্ড, পাসপোর্ট তৈরি করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ার খবর সামনে আসে।

এইসব অনুপ্রবেশকারীদের জন্য দেশজুড়ে ঘটা অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে বাঙ্গালির নাম জড়িয়ে যায় যদিও তারা আদপেও এই দেশেরই বাসিন্দা নয়। এদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা ক্রীড়া ভারতীর কলকাতা মহানগরের সংগঠন সম্পাদক আশিস পালের মা ফুলরানি পাল গত ১৮ নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার জিৎপুর-শিবতলার জেলার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

অখণ্ড ২৪ পরগনা জেলার পূর্বতন বিভাগ কার্যবাহ বিজনকৃষ্ণ কুলভী গত ২ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। ২৪ নভেম্বর ব্যারাকপুর সঙ্ঘ কার্যালয়ে তাঁর স্মরণে এক সভার আয়োজন করা হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ কুলভী-সহ জেলা ও বিভাগের বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে গ্রেপ্তার হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু
জেহাদি আক্রমণের মুখে প্রতিবাদরত হিন্দুরা

রাজীব শর্মা, বাংলাদেশ: গত ২৫ নভেম্বর বাংলাদেশে গ্রেপ্তার হয়েছেন ইসকন পুণ্ডরীক ধামের সভাপতি চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী মহারাজ (চিন্ময় প্রভু)। সেদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে অনবরত সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নৃশংস দমন-পীড়নের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। পালটা প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন হিন্দুরা। এই পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার করা হলো হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুকে। ইসকন মন্দিরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ঢাকা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার আধিকারিকরা চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার করে। গত ২২ নভেম্বর রংপুরে হিন্দুদের এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। সেখানে সেদেশের হাজার হাজার সংখ্যালঘু হিন্দুরা জড়ো হন। সেই সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন চিন্ময় প্রভু। বক্তব্য রাখার সময়, বাংলাদেশে বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। সভামঞ্চ থেকে তিনি হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন।

বাংলাদেশে জেহাদি অভ্যুত্থানের পর শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়। এরপর থেকে সেদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা হয়ে পড়ে পুরোপুরি বিপন্ন। সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময় প্রভু ঢাকা বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই ঢাকা শহরে হিন্দুরা একজোট হয়ে শাহবাগের দিকে পদযাত্রা করে আসতে থাকে। এই প্রতিবাদী পদযাত্রার উপর হামলা চালায় উন্মত্ত জেহাদিরা। তার ফলে প্রায় ৫০ জন হিন্দু গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের সক্রিয় কার্যকর্তারা।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের সভাপতি প্রদীপকান্তি দে বলেন যে বিমানবন্দরে সাদা পোশাকে উপস্থিত ডিবি অফিসাররা চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর গ্রেপ্তারিতে ক্ষুব্ধ হিন্দুরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়, শান্তিপূর্ণভাবে শাহবাগে প্রতিবাদ সমাবেশ সংঘটিত করে। তাদের তরফে কোনোরকম প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ না হওয়া সত্ত্বেও একদল দুর্বৃত্ত হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশ সনাতন পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও আইনজীবী সুমন কুমার রায় বলেন যে জেহাদি নিপীড়নের শিকার হিন্দুরা প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে তুললে তারা পুনরায় প্রতি মুহূর্তে সম্মুখীন হচ্ছে ভয়াবহ আক্রমণের, তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হচ্ছে মিথ্যা মামলা। তাদের ক্রমাগত হুমকি দেওয়া চলছে।

হিন্দুদের আট দফা দাবিসনদের বাস্তবায়ন রুখতে এবং সেই দাবিদাওয়া নিয়ে সরব চিন্ময় প্রভুর কণ্ঠরোধ করতে তাঁর বিরুদ্ধেও দায়ের হয়েছে মিথ্যা মামলা। হিন্দুদের বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে গোটা বাংলাদেশ।

পেফির জাতীয় পুরস্কার বিতরণ: চিরাগ চিকারা পেলেন পার্সন অব দ্য ইয়ারের সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৪ নভেম্বর, নয়া দিল্লিতে ক্রীড়া মন্ত্রালয় দ্বারা আয়োজিত ফিজিক্যাল এডুকেশন ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়া (পেফি)-র সপ্তম জাতীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ওয়ার্ল্ড কুস্তি চ্যাম্পিয়ন

চিরাগ চিকারাকে ইমার্জিং স্পোর্টস্ পার্সন অব দ্য ইয়ার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। খেলাকে বিশ্বে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সারা দেশের ২৯ জন শারীরিক শিক্ষক ও খেল প্রশিক্ষককে পেফি পুরস্কার প্রদান করা হয়। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামের সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের ড. কেশব গোপও রয়েছেন। তিনি অখিল ভারতীয় ক্রীড়া সংস্থা ক্রীড়া ভারতীর মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সহ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রালয়ের সংযুক্ত সচিব কুণাল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে খেলার প্রতি সারা দেশে গুরুত্ব বেড়েছে। যার সদর্থক প্রভাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলা প্রতিযোগিতার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভারতকে ক্রীড়া মহাশক্তি নির্মাণে শারীরিক শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খেলা ও খেলোয়াড়ের মধ্যে শারীর শিক্ষক এক বিশেষ পালন করেন। তিনি আরও বলেন, ফিট ইন্ডিয়া খেলো ইন্ডিয়ার পাশাপাশি আরও বহু যোজনা খেলোয়াড়দের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে এবং বড়ো সংখ্যায় পদক প্রাপ্তিও হচ্ছে। ফিজিক্যাল এডুকেশন ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ার সচিব ডঃ পীযুষ জৈন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পনা হলো ভারত বিশ্বের মধ্যে পরবর্তী খেল মহাশক্তি হোক এবং যেভাবে বিগত সময়ে খেলার ইকোসিস্টেম উন্নত হয়ে চলেছে, তাতে এই ধরনের পরিবর্তনই এক প্রমাণ।

‘দ্য প্রফেসর যশবন্তরাও কেলকর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড, ২০২৪’-এ সম্মানিত দীপেশ নায়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ‘ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশনাল সেন্টার ফর হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড’ (সংক্ষেপে টিচ) সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা দীপেশ নায়ার ‘দ্য প্রফেসর যশবন্তরাও কেলকর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড, ২০২৪’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন। শ্রবণশক্তিহীন, বধির ও ক্ষীণ-শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ছাত্রদের শিক্ষাদানের উপযোগী একটি শিক্ষাপ্রণালী (বা ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইকোসিস্টেম) উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দীপেশ নায়ারের উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং বিদ্যার্থী নিধি ট্রাস্ট যৌথভাবে প্রতি বছর সমাজ, শিক্ষা, পরিবেশ, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলা তরুণ প্রজন্মের কৃতীদের সম্মান জ্ঞাপন করে থাকে। বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যাপক যশবন্তরাও কেলকর। পরিষদের সংগঠনগত পরিধির প্রসার থেকে শুরু করে আদর্শগত দিকটি শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে অবদান অপরিসীম। তাঁর অবদান স্মরণে ১৯৯১ সালে শুরু হয় উপরোক্ত সম্মান-প্রদান। এই সম্মান প্রদানের উদ্দেশ্য হলো দেশের তরুণ প্রজন্মকে অর্থবহ সামাজিক কাজে প্রেরণা দান। তরুণ শিক্ষাবিদ, উদ্যোগপতি-সহ নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট জনকে প্রতি বছর এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। পুরস্কারস্বরূপ এক লক্ষ টাকা, একটি মানপত্র ও একটি স্মারক প্রাপকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গত ১০ নভেম্বর বিদ্যার্থী পরিষদের তরফে প্রকাশিত একটি প্রেস রিলিজে এই বছর পুরস্কারপ্রাপক হিসেবে দীপেশ নায়ারের নাম ঘোষিত হয়। অ্যাওয়ার্ড সিলেকশন কমিটির সদস্য বিদ্যার্থী পরিষদের অখিল ভারতীয় সভাপতি ড. রাজশরণ শাহি, অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লা, অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক আশিস চৌহান এবং সিলেকশন কমিটির কনভেনর (আহ্বায়ক) অধ্যাপক মিলিন্দ মরাঠে পুরস্কারপ্রাপক দীপেশ নায়ারকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানান। শ্রবণশক্তিহীনদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দীপেশ নায়ারের অক্লান্ত পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে আগামীদিনে এই কাজকে অব্যাহত রাখার বিষয়ে দীপেশের সাফল্য কামনা করেন তাঁরা।

মার্কিন স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান পদে বঙ্গসন্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥

এক বঙ্গ সন্তান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের মাথায় বসছেন। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ডাঃ জয় ভট্টাচার্যের জন্ম কলকাতায়। তিনি একাধারে একজন ডাক্তার ও অর্থনীতিবিদ। আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস্ অফ হেলথ্ (এনআইএইচ)-এর পরবর্তী ডিরেক্টর হিসেবে তাঁকে নির্বাচন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে আমেরিকার হেলথ্ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস বিভাগের দায়িত্বে রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রকে বেছে নিয়েছিলেন ট্রাম্প। কেনেডির সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ হয় ডাঃ জয় ভট্টাচার্যের। এনআইএইচকে ঢেলে সাজানো থেকে শুরু করে মার্কিন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে তাঁর মতামতে কেনেডি অভিভূত হন বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর।

প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলা শিবির-২০২৫

ব্রহ্মচারী শ্রীহৃষীকেশ মহারাজজী দ্বারা পরিচালিত শিবশক্তি সেবাধাম প্রতি বছরের মতো আগামী ২০২৫ সালে প্রয়াগরাজ পূর্ণকুম্ভমেলাতে শিবিরের আয়োজন করতে চলেছে। শিবশক্তি সেবাধাম যেভাবে অন্যান্য কুম্ভমেলাতে তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ও তীর্থভ্রমণের সুব্যবস্থা করে থাকে, সেভাবেই প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলাতেও সমস্ত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। শিবির ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকট হওয়াতে পুণ্যস্নান সহজ হবে। শিবিরের সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক তীর্থযাত্রীরা অগ্রিম বুকিং করুন। আসন সংখ্যা সীমিত। কুম্ভমেলায় সন্তভাণ্ডারা, ব্রাহ্মণভোজন ও সেবাদানের মতো পুণ্যকাজে দানধ্যান করতে ইচ্ছুক ভক্তরা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দান করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে ফোনেও যোগাযোগ করা যাবে।

Google Pay/ PhonePe No.- 9451268600

D.47/49,Ramapura.(Opposite of Mazda Cinema Carparking), Varanasi (UP).

Mob. No. - **9451268600, 7985210182.**

Bank Account datails- Name— Hrishikesh Brahmachari.

A/C No - 34903180246. IFSC -SBIN0001190

State Bank of India (SBI), Varanasi, U.P.

বিঃ দ্রঃ- আধার কার্ড, পাসপোর্ট সাইজের দুটি ছবি এবং ১টি বিছানার চাদর সঙ্গে আনতে হবে।

মসজিদ সার্ভে ঘিরে জেহাদি হিংসায় মৃত ৪, সম্ভলে বন্ধ ইন্টারনেট

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৪ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের শাহি জামে মসজিদের সমীক্ষা ঘিরে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে তা প্রবল হিংসার রূপ নেয় এবং চার জনের প্রাণহানি ঘটে। রাস্তা জুড়ে চলে পাথর ছোঁড়া, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও গোলাগুলি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পিএসি, আরআরএফ এবং আরএএফের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়। গত ১৯ নভেম্বর আদালতের নির্দেশে জামে মসজিদে জরিপের কাজ শুরু হয়। জরিপকে ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কারণ আবেদনকারীদের দাবি অনুযায়ী মসজিদের স্থানে আগে একটি হিন্দু মন্দির ছিল। তার নাম ছিল— হরিহর মন্দির। ১৫২৯ সালে মুঘল বাদশা বাবর মন্দিরটি ধ্বংস করে। আবেদনকারীদের দাবি ১৯৯১ সালের উপাসনা স্থান আইন লঙ্ঘন করছে বলে সওয়াল করে মুসলমান পক্ষ। জরিপের দিন সকালে সমীক্ষার কাজ ফের শুরু হলে উন্মত্ত জেহাদিদের একটি দল মসজিদের কাছে জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যখন পুলিশকে লক্ষ্য করে চলে পাথর বর্ষণ এবং আশেপাশের বাড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ইট-পাথর এবং নানা ধ্বংসাবশেষ। হিংসার জেরে শহরজুড়ে অঘোষিত কার্ফুর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে জেহাদিদের ছত্রভঙ্গ করে। বর্তমানে এলাকায় বিএনএসএসের ১৬৩ ধারা জারি করা হয় এবং ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ঘটনায় নিহতের সংখ্যা চার। একাধিক পুলিশকর্মী আহত হন, যার মধ্যে সার্কেল অফিসারকে ছুরি মারা হয় এবং এক কনস্টেবলের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। ২১ জনকে আটক করা হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এনএসএ) প্রয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে যে হিংসায় জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার পরেও শহরের পরিস্থিতি ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। ইন্টানেট পরিষেবা ছিল সাময়িকভাবে বন্ধ। স্কুল-কলেজও বন্ধ রাখা হয়।

দেশজুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের নির্বাচনী সাফল্য

ড. রামানুজ গোস্বামী, কলকাতা।। এই বছর ভারতে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। আর লোকসভার ভোটের পরেই গত ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচন। গত ৮ অক্টোবর হয় ভোট গণনা। ৯০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ৪৮টি আসন পেয়ে জয়যুক্ত হয়। বিরোধী কংগ্রেস থেমে যায় ৩৭টি আসনে। লোকসভা, হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জয়ের সেই ধারা এবার অব্যাহত রইল মহারাষ্ট্রে। গত ২০ নভেম্বর এক দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এই রাজ্যে। গত ২৩ নভেম্বর ভোটের ফল বেরোলে দেখা যায় যে রাজ্যের ২৮৮টি বিধানসভা আসনের মধ্যে এনডিএ জোট পেয়েছে মোট ২৩৫টি আসন। তার মধ্যে বিজেপি ১৩২টি, একনাথ শিণ্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা ৫৭টি এবং অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি ৪১টি আসন পেয়েছে। এছাড়াও, এনডিএ জোটের অন্তর্গত আরও ৪টি দলের ৫ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠী) ২০টি, কংগ্রেস ১৬টি, এনসিপি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী) ১০টি আসন এবং সমাজবাদী পার্টি দু'টি আসন পেয়েছে। গত ১৩ ও ২০ নভেম্বর দু'দফায় ঝাড়খণ্ডে সংঘটিত হয় বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ৩৪টি, কংগ্রেস ১৬টি, আরজেডি ৪টি, সিপিআই (এমএল-লিবারেশন) দু'টি এবং বিজেপি ২১টি আসনে জয়যুক্ত হয়েছে।

মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে ১৩টি রাজ্যের ৪৬টি বিধানসভা আসনে অনুষ্ঠিত হয় বিধানসভা উপনির্বাচন। বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলি পেয়েছে ২৬টি। কংগ্রেস ৭টি, তৃণমূল কংগ্রেস ৬টি, আম আদমি পার্টি তিনটি এবং সমাজবাদী পার্টি দু'টি আসনে জয়লাভ করেছে। তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ৯টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে বিজেপি ৭টি আসন পেয়েছে। কেরালার ওয়ানাড় ও মহারাষ্ট্রের নান্দেড় লোকসভা আসন দু'টি ধরে রেখেছে কংগ্রেস। ওয়ানাড় থেকে জয়ী হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা ওয়াধেরা। রাজনৈতিক মহলের মত হলো— দেশ জুড়ে সংঘটিত নির্বাচনগুলিতে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলগুলির সাফল্যলাভ আগামী বছর বিহার ও দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।